সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ডিসেম্বর ২০১৪

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলার পটচিত্র

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

গোদরেজ গ্রুপ

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ রাষ্ট্রপতি ভবনে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎ

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম হামিদ আনসারীর সাক্ষাৎ

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের সাক্ষাৎ

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ রাষ্ট্রপতি ভবনে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতের রাজ্যসভার বিরোধীদলীয় নেতা শ্রী গুলাম নবী আজাদের সাক্ষাৎ

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ বিয়ালিশ | সংখ্যা ০৯ | অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২১ | ডিসেম্বর ২০১৪

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের Facebook page: /HighCommissionofIndiaDhaka

লাইক ও ভিজিট করুন ভারত বিচিত্রা Facebook page: /BharatBichitra; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Igcc Dhaka, Follow us on twitter /ihcdhaka

বাংলার পটচিত্র

গোদরেজ গ্রুপ

সূচিপত্র

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ০৪
বাংলার পটচিত্রের প্রাচীন কথা ০৫
অনুবাদ গল্প: সতীচরিতাম্‌ত ১০
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ১৬
গঙ্গা জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ১৯
গোদরেজ গ্রুপ ॥ শিল্পোদ্যোগের তালা খোলা ২২
কবিতা ২৪
ঐতিহাসিক ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ২৬
বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৩০
ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৩
ছোটগল্প: জাদুঘর ৩৮
ছোটগল্প: তৃতীয় পক্ষ ৪৩
শেষ পাতা: শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ৪৮

ঐতিহাসিক ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান পশ্চিমসীমান্তে বিমান হামলা দিয়ে ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়, সে রাতেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা দিলেন: 'আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল।' সমস্ত শরণার্থী শিবিরে উলুধ্বনি দিয়ে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এ যুদ্ধের আহ্বানকে স্বাগত জানানো হল। ভারত সরকার এদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের যুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে। ভারতের লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকবাহিনির আত্মসমর্পণের সংবাদ জানান। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে ভারতের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

আলোকিত মানুষ গড়তে

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহ্যবাহী কোটচাঁদপুরের কৃতি সন্তান এ কে এম মনিরুজ্জামান একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানী বিহারীদের হাতে শহীদ হন। সময়টা ছিল ২৪ মার্চ, ১৯৭১। সে দিন অন্ধকারের রাত শেষ হবার আগে ফজরের আজান ধ্বনিত হবার মুহূর্তে ভোর রাতে নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়। সে সময় তাঁর কর্মস্থল ছিল সৈয়দপুর। রেলওয়ের একজন দক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে তিনি সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন দেশ এবং জাতিকে ভালবেসে। সেই শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থানীয় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয় ২০১০ সালের ২৪ মার্চ– 'শহীদ মনিরুজ্জামান স্মৃতি পাঠাগার' নামে যার পরিচিতি।

আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতবর্ষ। সে দেশের আঞ্চলিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানার জন্য ও রুচিশীল পাঠক সৃষ্টিতে এবং তরুণ প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আপনাদের প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রার* সৌজন্য কপি বরাদ্দ করে পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করবেন, এই প্রত্যাশা।

জিয়ারুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক
শহীদ মনিরুজ্জামান স্মৃতি পাঠাগার
অধ্যক্ষ আব্দুল মতলেব সড়ক, কোটচাঁদপুর
ঝিনাইদহ

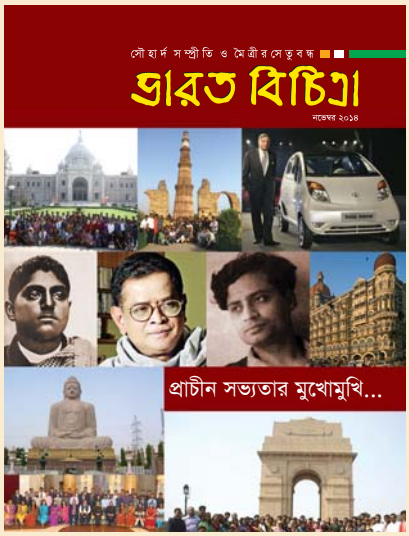

উপায় কি?

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করেছে। দু'দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা যেন একই সূত্রে গাঁথা। বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত সম্পর্কে জানতে হলে জনপ্রিয় ভারত বিচিত্রা পড়া চাই, এছাড়া কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের অবদান সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমি দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিতভাবে *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করেছি। ১৯৮৯ সালে পাবনা থেকে ঢাকায় চলে আসার পর থেকে আর নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি পড়া হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গা হতে সংগ্রহ করে পড়ি। নিয়মিত পড়তে চাইলে উপায় কি?

সৈয়দ একরামুল হক প্রিন্সিপাল অফিসার
অগ্রণী ব্যাংক লি., তেজগাঁও শি/এ কর্পোরেট শাখা
৩১৫/এ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২১৫

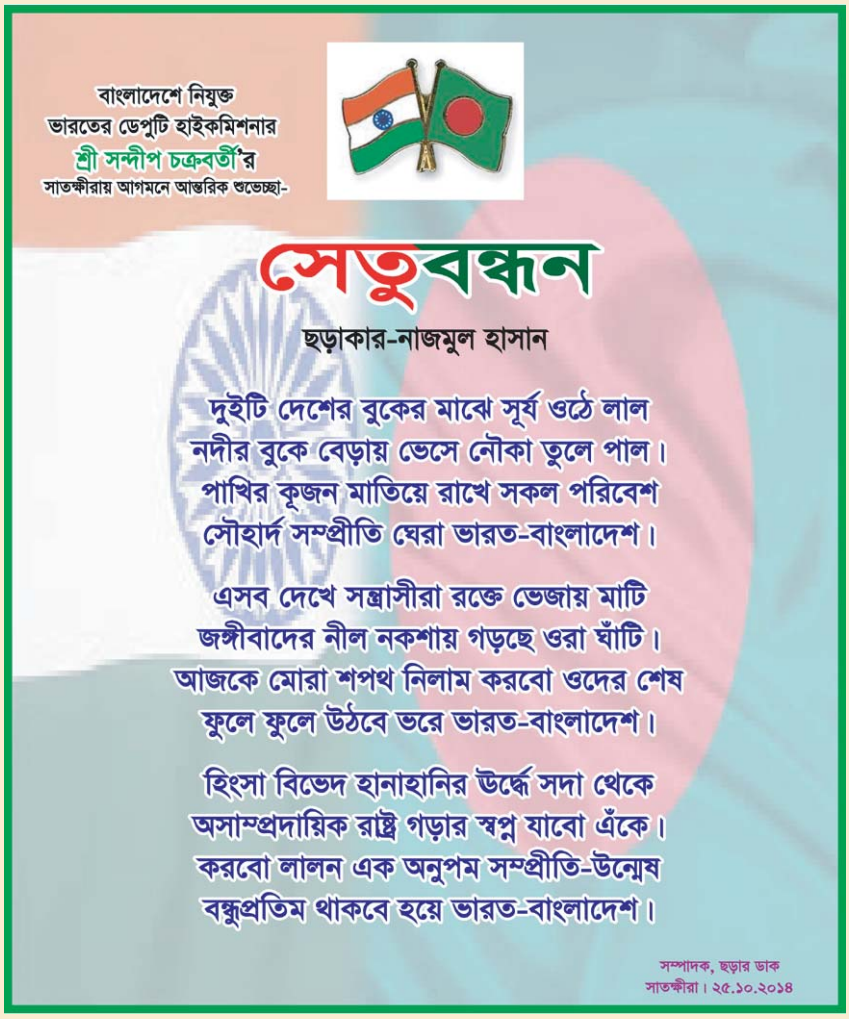

নির্ভরযোগ্য মনে করি

একসময় আপনাদের বহুল প্রশংসিত ভারত বিচিত্রার নিয়মিত পাঠক/ গ্রাহক ছিলাম। বিগত কর্মস্থল চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় থাকাকালীন আপনাদের সরবরাহকৃত পত্রিকাটি যথাসময়ে আমার ঠিকানায় পৌঁছে যেত। বেশ কিছুদিন হল আমার নিজ অঞ্চল বরিশালে আসার পর নানান ব্যস্ততার কারণে ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি আপনাদের অবহিত করা হয়নি– আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগও হয়ে ওঠেনি। প্রায় সমাপ্তির পথে চাকরিজীবনে সময় কাটানোসহ মনের খোরাক ও চিত্ত বিনোদনের জন্য *ভারত বিচিত্রাকে* নির্ভরযোগ্য মনে করি। আমার বর্তমান কর্মস্থলে পাঠানো কি সম্ভব?

নিখিল চন্দ্র মিশ্র অফিসার
সোনালী ব্যাংক লি. বরিশাল কর্পোরেট শাখা
বরিশাল

সম্পাদকীয়

কবি বলেছেন, প্রতিদিনই জন্মদিন। সেই হিসেবে মহাকালের গর্ভে একেকটি ক্ষণ, একেকটি দিন হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই উঁকি দেয় আরেকটি ক্ষণ, আরেকটি দিন– আরেকটি জন্মদিন। নতুনকে আবাহন করে কবি বলেছেন, হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ/ তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন সূর্যের মতন। নতুনের প্রকাশ সনাতন, সর্বক্ষণ। দেখতে দেখতে ২০১৪ নামের কালখণ্ডটি বিলীন হয়ে যাবে মহাকালে, ঘড়ির কাঁটা তখন সময় নির্দেশ করবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২.০০টা। তারপর ২০১৪ শুধু জেগে থাকবে দিনপঞ্জির পাতায়। বিদায় ২০১৪।

শীতের একেকটি দিন কুয়াশামলিন। চারিদিক যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। ঘনকুয়াশায় যেন সময়ই আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে হাড়-কাঁপানো উত্তুরে হিমেল বাতাস। পাতাঝরা দিনের শেষে ঘুমের দেশে পাড়ি জমাতেই যেন যত আনন্দ– যেমন শীতনিদ্রা উপভোগ করে কোন কোন সরীসৃপ।

এমনি কুয়াশা-ঘেরা এক শীতের সকালে যেন কী আনন্দে সকলের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল নির্মোকে আত্মগোপনের পর যেন সেদিন সবাই বল্‌গাহীন পাগলপারা হয়ে উঠেছিল– এখানে-সেখানে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ, গুলির শাঁ-শাঁ সচকিত শব্দউৎক্ষেপ– তবু যেন আর ভয় নেই। খোলা ছাদে কিশোর-কিশোরীর জটলা, মায়ের দীর্ঘশ্বাস পেরিয়ে বাবার সান্ত্বনা– 'এবার খোকা ঘরে ফিরবে দেখ ঠিকই।' হ্যাঁ, পরম আকাঙ্ক্ষার বিজয়ের ক্ষণ এসে গেছে। জগদ্দল পাথরের মত যে হানাদার বাহিনি বুকের ওপর চেপে বসেছিল বাঙালি জাতির, আজ একটি বেতার ঘোষণায় সেই লৌহ-যবনিকা ছত্রখান হয়ে গেছে। আজ বিজয়ের দিন। ষোলই ডিসেম্বর ১৯৭১। বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে যাবার জন্যে সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন। এই সেই রেসকোর্স ময়দান, যেখানে ন'মাস আগে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। আজ সেখানেই পাকিস্তানি-বাহিনির আত্মসমর্পণের আয়োজন করা হয়েছে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে যে স্বাধীনতা, তারই শীর্ষবিন্দু আজ বিকেল ৪টায় প্রত্যক্ষ করা যাবে রেসকোর্সে পাকি-বাহিনির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। বাঙালির জীবনে এই উদ্‌যাপনের ক্ষণটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই শুভক্ষণেই জন্ম হবে একটি স্বাধীন জাতির। আজ ২০১৪-য় যখন আমরা সেই বিজয়ের ক্ষণটি উদ্‌যাপন করছি, আমরা যেন সেদিনের সেই প্রেক্ষিতটি ভুলে না যাই।

প্রশিক্ষণ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন্নআইটিইসি) কর্ম সূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:

fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to

fscom@hcidhaka.gov.in

প্রবন্ধ

বাংলার পটচিত্রের প্রাচীন কথা

ড. সুমনা দত্ত চট্টোপাধ্যায়

বাংলার চিরন্তন লোকশিল্পের একটি ধারা পটচিত্র। বাংলাসহ ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই পটচিত্র অঙ্কনের চর্চা হয়। ওড়িশার রঘুরাজপুর, দ-শাহী, বাসুদেবপুর, বিহারের জিতবার পুর, ঝাড়খণ্ডের দুমকা প্রভৃতি স্থানে যে-সব পটচিত্র দেখা যায়, স্থানীয় শিল্পীরাই এর কারিগর। বর্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র বাংলার, আরো বিশেষভাবে বললে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পটচিত্রের ওপরেই আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাচীনকালে যখন কাগজের ব্যবহার প্রচলিত হয়নি, মূলত কাপড়ের ওপরই পট আঁকা হত। মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পটচিত্র বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ভারতের প্রথম জাত পটুয়ার নাম গোসাল। গোশালায় তাঁর জন্ম। আনুমানিক ৪৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁর পিতাও ছিলেন পটুয়া– নাম মঙ্খলী, মাতার নাম ভদ্দা। প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে তাঁকে ডাকা হত মঙ্খলী পুত্ত গোসাল নামে। মঙ্খ বলতে বোঝায় সেকালের ভ্রাম্যমাণ চারণ কবি যাঁরা 'চরণচিত্র' বা চলমান ছবির পশরা নিয়ে গ্রামেগঞ্জে ধর্মকথা শোনাতেন বা লোকশিক্ষা দৃশ্য পাঠ দিতেন। গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'পটুয়া' কবিতায় লিখেছেন:

'গানের সুরে পুরাণ শ্রুতি
ইতিহাসের বাণী;
দেশের নরনারীর ঘরে
এরাই দিত আনি।'

একালের যমপটের পটুয়া কিংবা চক্ষুদান পটের জাদু পটুয়ার মত সেকালেও যম পট্টিকারদের যে ঘরে ঘরে দেখা মিলত তার উলেখ আছে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে এবং বাণভট্টের হর্ষচরিত-এ। মুদ্রারাক্ষস-এর প্রথম অঙ্কে লেখা আছে চাণক্য নিপুণক নামে এক চরকে নিযুক্ত করছিলেন শত্রুপক্ষের কিছু গোপন তথ্য জানার জন্য। কাজ সমাধা করে সে চাণক্যর বাড়িতে ফিরে এল এক যমপট্টিকের ছদ্মবেশে।

সম্যুত্তনিকায় নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উলেখ পাওয়া গেছে ধর্মীয় শোভাযাত্রার সময় নৃত্যগীতবাদ্যযন্ত্রীদের এবং পশুপ্রাণির সম্মেলনে অনেক সময় 'চরণচিত্র' বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এগুলিকে কেউ কেউ বলেছেন সে যুগের 'পোর্টেবল পিকচার গ্যালারি।' ছবি আঁকা হত মানুষের সুখদুঃখ এবং ভাগ্য-ভবিতব্য বিষয়ে। মৃত ব্যক্তির কর্মকা-ও স্থান পেত চরণচিত্রগুলোতে। এইসব ছবিগুলোকে 'লেখ্যচিত্র' হিসাবেও পরিচয় দেওয়া যায়। তবে 'লেপ্যচিত্র' বা ভিত্তি ও দেওয়াল চিত্র থেকে এটি পৃথক। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন এই চরণচিত্র বা লেখ্যচিত্রই পরবর্তীসময়ে পটচিত্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে। পটের প্রাচীনত্বের বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে ধ্রুব দাস লিখেছেন, 'পটের প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়া গেছে মিশরে। আবার ইজরায়েলের এক পর্বতগুহায় ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনিসংবলিত জড়ানো পট সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া চিন, জাপান, তিব্বত এবং নেপালেও বুদ্ধের জীবনীসংবলিত পটের প্রচলন রয়েছে, সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এই প্রসঙ্গে চিনের বিখ্যাত নয় ড্রাগনি পট স্মরণীয়। এই পটের সৃষ্টিকর্তা তাও কবি ও চিত্রকর হেন জুঙ্গ। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পটটি আঁকেন। মেঘ ও তরঙ্গের দোলায় চেপে ড্রাগন এই পটে দেখা দিয়েছে। চিনের স্ক্রোল বা জাপানি মাকিমানোও জড়ানো ছবি। কিন্তু পটের মত গানের সঙ্গে তার যোগ নেই। ওড়িশা বা বিহারের পটেও গান নেই। গানে ছবিতে মেশানো যৌগিক শিল্পরূপ হিসাবে জড়ানো বাংলার পটের নিজস্ব মূল্য অনেক।

একালের যমপটের পটুয়া কিংবা চক্ষুদান পটের জাদু পটুয়ার মত সেকালেও যম পট্টিকারদের যে ঘরে ঘরে দেখা মিলত তার উলেখ আছে সপ্তমঅষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ বিশাখ দত্তের *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে এবং বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এ। *মুদ্রারাক্ষস*এর প্রথম অঙ্কে লেখা আছে চাণক্য নিপুণক নামে এক চরকে নিযুক্ত করছিলেন শত্রুপক্ষের কিছু গোপন তথ্য জানার জন্য। কাজ সমাধা করে সে চাণক্যর বাড়িতে ফিরে এল এক যমপট্টিকের ছদ্মবেশে। *মুদ্রারাক্ষস* অষ্টম শতাব্দীর সৃষ্টি আর *হর্ষচরিত* সপ্তম শতকের। দ্বিতীয় গ্রন্থে যম পটুয়ার পট প্রদর্শন ব্যাপারটি কিছুটা প্রতীকী চরিত্র নিয়েছে। রাজা প্রভাকর বর্ধনের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে হর্ষবর্ধন যুদ্ধ শিবির থেকে যখন ফিরছেন তখন রাজধানীর পথে কয়েকটি অশুভ ঘটনা তাঁর চোখে পড়েছিল। দোকান-পাট বন্ধ, দেবমন্দিরে সবাই প্রার্থনা করছে; শুকনো ডালে বসে কাকেরা কর্কশ চিৎকার করছে, প্রকাশ্যে নরমাংস বিক্রি হচ্ছে ইত্যাদি। দোকানের পথে একদল বাচ্চা এক যম পটুয়াকে ঘিরে বসে আছে। যমপট্টিক লম্বা লাঠিতে ঝোলানো পটটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে একটি শরকাঠি দিয়ে পটের চিত্রগুলো দেখাচ্ছে। জড়ানো পটে প্রেতলোকের নানা বৃত্তান্ত আঁকা। ভয়ংকর এক মহিষের পিঠে বসে আছেন প্রেতলোকের দেবতা যম। যমপট্টিকার গাইছিল:

'মাতাপিতা সহস্রাণি পুত্রদার শতানিচ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্॥

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অনূদিত হর্ষচরিতে এই ছড়াটিকে আমরা পাই এইভাবে:

'হাজার হাজার মা আছে, হাজার
হাজার বাপ আছে; ওরে
ছেলেও আছে; ওরে স্ত্রীও
আছে। যুগের পর যুগ চলে
যাচ্ছে, তুই কে, ওরা তোর কে?'

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'বাণ রাজবর্ধনকে তাঁর পিতার অন্তিমকালের জন্য প্রস্তুত করবার কৌশল হিসেবে এই যমপট্টিকের অবতারণা করলেও 'যমপট্টের অস্তিত্বের প্রাচীনতার দিক থেকে এই ছবিটি অত্যন্ত উলেখযোগ্য। বাণ নিজে তাঁর জীবনে বহুবার এই ধরনের পট প্রত্যক্ষ করে না থাকলে তাঁর এই বর্ণনা এতটা সজীব ও প্রাণবন্ত হতে পারত না। আরও উলেখযোগ্য কথা এই যে, এই বর্ণনা আধুনিক কালের পটুয়াদের সম্বন্ধেও অনায়াসে প্রযোজ্য হতে পারত।' একবিংশ শতাব্দীতেও দেখা যায়, বীরভূম জেলার পটচিত্রের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে 'যমপট'– যা কিনা গ্রামের সরল দর্শক শ্রোতাদের পারলোক যমদূতের দ্বারা শাসিত হওয়ার ভয় দেখিয়ে মর্ত্যে পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার শিক্ষা দেয়। এছাড়াও *অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র* (খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক), *উত্তর রামচরিত* (খ্রিস্টীয় ৭ম/৮ম শতক), *বিদগ্ধ মাধব* (খ্রিস্টীয় ৫ম শতক), *সংযুক্ত নিকায় খন্দ* (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক), কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক) এবং পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীতে* (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক) পটের কথা আছে। অভয়দত্ত শ্রীর রচিত *চতুর শীতিসিদ্ধপ্রবৃত্তি* নামক তিব্বতি গ্রন্থে পুতলি পা এবং ভন্দে পা নামে দু'জন পটচিত্রকরের সন্ধান পাওয়া যায়; যাঁরা চর্যাপদের যুগে বর্তমান ছিলেন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, গুরুসদয় দত্ত, সুধাংশুকুমার রায় প্রমুখের মত আধুনিককালের গবেষকরাও আকৃতি অনুসারে পটকে দু'ভাগে ভাগ করার পড়্গাপাতী। যেমন, জড়ানো বা দিঘল বা লাটাই পট এবং চৌকো পট। প্রথম ভাগটিকে যেমন লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি– এই দুই উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়, দ্বিতীয়টির তেমনি বর্গাকার ও আয়তাকার– এই দুই উপবিভাগ। এছাড়াও ইদানীংকালে ঘর সাজাবার জন্য শহুরে বাবুজনেদের চাহিদামত অল্প কিছু বৃত্তাকার পটও আঁকা হচ্ছে। তবে আমার বর্তমান আলোচ্য যেহেতু বাংলার প্রাচীন পটচিত্র– তাই বৃত্তাকার পটের আলোচনার অবকাশ নেই।

গোটানো, জড়ানো, লাটাই এবং দোলিয়া বা দিঘল এই সবক'টি নামই চালু আছে যে পটের, তা সাধারণত ওপর

পটকার মৃতব্যক্তির পরিবারের কর্তাকে বলেন যে আপনাদের বাড়িতে যিনি কিছুদিনের মধ্যে মারা গেছেন তিনি চক্ষুর অভাবে মৃত্যুলোকে বড় কষ্টে আছেন। যখন ঐ লোকটি বেঁচে ছিলেন তখন তিনি এমন কিছু গর্হিত কাজ করেছিলেন যার জন্য ভগবান বা মারাংবুরু তাঁকে এমন শাস্তি দিয়েছেন। মৃতের পরিজনেরা এই কথা সরল মনে বিশ্বাস করে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। তখন পটকার একটি কাঁসার পাত্রে একটু জল নিয়ে আসতে বলেন এবং তাঁর হাতের তুলি দিয়ে পটের চোখ এঁকে দেন এবং এতে মৃত ব্যক্তির দুঃখ দূর হয়ে গেল বলে ঘোষণা করেন।

থেকে নীচে খোপে খোপে ছবি দিয়ে ভরা। পর পর খোপের ছবিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাটকীয় ক্রমপর্যায় রক্ষা করা হয়। অনেকগুলি পারলৌকিক এবং গোঁসাই পটে ওপর থেকে নীচে না সাজিয়ে লেখাটি আড়াআড়ি সাজানো হয়। সাঁওতাল ও ভূমিজদের পটে আড়াআড়ি এবং ওপরনী চে দু'রকমের লেখাই দেখা যায়। লেখার প্রকাশভঙ্গি সরাসরি এবং তির্যক দুইই আছে। তবু দেখা গেছে, যুগের প্রয়োজনে বা হাওয়া অনুসারে পটুয়াকে নিজ কর্তব্য ঠিক করতে হয়েছে। ওই তির্যক প্রকাশভঙ্গির সাময়িক বাজার আছে বলেই তাকে ওই লেখা লিখতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কালীঘাট পটের কথা বলা যায়। যে ধারাটির চরম পরিণতি ঘটেছিল কালীঘাটের প্রচলিত কলমে। ডেভিড ম্যাকাচ্চিওন এবং সুহৃদ ভৌমিকের মতে: 'There are two types of patas (paintings)-- the chauka which is a square or rectangle, and the jarono or gutano, which is scroll. The chauka canvas is used for painting one particular deity or mythical or social subject, or an animal for the pilgrims children. These paintings are mainly for sale and Kalighat Bazar paintings are the ultimate form of such pats.'

সাঁওতাল সমাজে 'চক্ষুদান' নামে এক শ্রেণীর পট আছে; যাকে চৌকো পটের শ্রেণীতে ফেলা যায়। একজন পটকার বা পটকিরি (বাঙালিরা এঁদের যাদু পটুয়া বলেন) প্রথমে সন্ধান নেন কাদের বাড়িতে কিছু কালের মধ্যে একজন মারা গেছেন। তারপর সেই মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে বাড়ির কর্তার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতে থাকেন। পরে ঐ মৃতব্যক্তির পরিবারের কর্তাকে বলেন যে আপনাদের বাড়িতে যিনি কিছুদিনের মধ্যে মারা গেছেন তিনি চক্ষুর অভাবে মৃত্যুলোকে বড় কষ্টে আছেন। যখন ঐ লোকটি বেঁচে ছিলেন তখন তিনি এমন কিছু গর্হিত কাজ করেছিলেন যার জন্য ভগবান বা মারাংবুরূ তাঁকে এমন শাস্তি দিয়েছেন। মৃতের পরিজনেরা এই কথা সরল মনে বিশ্বাস করে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। তখন পটকার একটি কাঁসার পাত্রে একটু জল নিয়ে আসতে বলেন এবং তাঁর হাতের তুলি দিয়ে পটের চোখ এঁকে দেন এবং এতে মৃত ব্যক্তির দুঃখ দূর হয়ে গেল বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর ঐ চোখ আঁকা পটটিকে স্থানীয় নদী বা পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং যে পাত্র থেকে জল নিয়ে ঐ চোখটি আঁকা হল সেই পাত্রটি দাবি করেন। সম্পন্ন গৃহস্থ হলে মুরগি বা ছাগলও দাবি করেন। এইভাবে চক্ষুদান পট এঁকে প্রাচীনকালের মত আজও যাদু পটুয়ারা উপার্জন করে থাকেন।

ভারতের স্বাধীনতাপরবর্তী যুগে ১৯৫১ সালে জনগণনা দপ্তরের গ্রন্থে সুধাংশুকুমার রায় পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া বসতির যে অমূল্য তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আজকের জেলাওয়ারি পটুয়া বসতির প্রায় কিছুই মিলবে না। বিনয় ভট্টাচার্য তাঁর *কালচারাল অসিলেশান* (১৯৮০) গ্রন্থে পটুয়াদের নিয়ে যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছিলেন তাতে ফুটে উঠেছে এক ক্রমিক ধ্বংসের ছবি। তাঁর আদমশুমারি অনুযায়ী, বীরভূম জেলায় পটুয়াদের মোট সংখ্যা ১১৬৮; ৩৯টি গ্রামে ২৪৮ ঘর পটুয়ার বাস, সারা পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াদের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ৫০০০। বীরভূমে তিন পুরুষের হিসেব নিয়ে তিনি দেখেছিলেন, পটুয়ারা ক্রমাগত 'স্ববৃত্তি' ছেড়ে দিচ্ছে। ঠাকুরদার প্রজন্মে ৭২.৫১ শতাংশ পট লিখত; বাপের প্রজন্মে ৬৮.৯১ শতাংশ আর বর্তমান প্রজন্মের মাত্র ৫১.৫৯ শতাংশ নিজের বৃত্তি আঁকড়ে রয়েছে। এই পরিসংখ্যান বিনয় ভট্টাচার্য ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সংখ্যাটি বাড়েনি, ক্রমশ কমেছে।

মেদিনীপুর জেলা পটচিত্রের ব্যাপক চর্চাক্ষেত্রের অন্যতম। যেসব গ্রামগুলিতে পটুয়ারা বসবাস করতেন, সেগুলি হল: নাড়াজোল, সিউড়ি, গোগ্রাম-কেশববাড়, ঠেকুয়াচক, নির্ভয়পুরবাসু দেবপুর, নয়া, মালিগ্রাম, মাদপুর-পাপর আড়া, আকুবপুর, চৈতন্যপুর, কুমির মারা, নানকাচক, হাঁসচড়া, আমদাবাদ, হবিচক, মুরাদপুর, কুতুবপুর, গোল গ্রাম, বিনপুর, ষাঁড়পুর প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলার চেয়ে বিষয়-বৈচিত্র্য এই জেলায় অনেক বেশি। জড়ানো পটের বিয়ষবস্তুর মধ্যে উলেখ্য হল, রামায়ণ কাহিনি অনুসরণে সিন্ধু বধ, তাড়কা বধ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, সেতু বন্ধন, রাবণ বধ, তরণী সেন বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ভাগবত কাহিনি থেকে সংগৃহীত কৃষ্ণলীলার নানান কাহিনির মধ্যে কৃষ্ণজন্ম, কালীয় দমন, নৌকাবিহার, বস্ত্রহরণ, ননীচুরি, কৃষ্ণকালী প্রভৃতি। মহাভারতের কাহিনি রূপায়ণের পট বেশি দেখা না গেলেও নরমেধ যজ্ঞ, হরিশচন্দ্র, দাতা কর্ণ, সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি গান নিয়ে বেশ কিছু পট অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য নিয়ে রচিত শিব-পার্বতী লীলা, সতীর দেহত্যাগ, গঙ্গাদুর্গার ঝগড়া, দুর্গার শাঁখা পরা, দুর্গা পটে অসুর বধের পালা ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্য থেকে আহরিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে মনসা পট বা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি, কমলেকামিনী বা শ্রীমন্ত মশান প্রভৃতি। এছাড়াও আছে গৌরাঙ্গ লীলা বা নিমাই সন্ন্যাস, সত্যনারায়ণ, জগন্নাথ লীলা, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন প্রভৃতি। পটের বিষয়বস্তুর মধ্যে আর একটি উলেখযোগ্য পট ছিল যমপট। মেদিনীপুর জেলায় কিছু আঁকা হলেও বীরভূম জেলা যমপটের জন বিখ্যাত। পাপীদের যময ন্ত্রণার পাশাপাশি পুণ্যাত্মাদের আরামপ্রদ জীবনের চিত্র দর্শিত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এই পটটি বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়ে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা বা চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রভৃতি পটের শেষে সাধারণত এই যমপটের দু-একটি দৃশ্য সংযোজন করা হয়। কাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার পর একটা ছবি খুলে যখন গান গাওয়া হয়, তা যেন চলচ্চিত্র

দর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়।

পটের শৈলীর মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল বেশির ভাগ পটই রেখাপ্রধান। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতির মত এসব ফিগারের অ্যানাটমি পাশ্চাত্যের মত বাস্তববাদী নয় বরং একটু ভাব প্রধান। পারস্পেকটিভের ব্যবহারও এসব ছবিতে কম। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এত সরল সাধাসিধে গ্রাম্য কায়দায় আঁকা হলেও ফিগারগুলির ভাবমূর্তি নিখুঁত ও পরিপূর্ণ।

পটের আঙ্গিকে সাধারণ কিছু মিল থাকলেও বাংলার বিভিন্ন স্থানের পটের শৈলীতে কিছু পার্থক্যও লক্ষ্যণীয়। এইসব পার্থক্যের ফলে পটচিত্রে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ কথা ঠিকই যে, অনিবার্য কারণেই পটচিত্রাঙ্কনের উৎকর্ষ হ্রাসমান। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাংলার নানাস্থানে পটচিত্রের যে ধারা আজ বহমান তাতে বিভিন্ন ঘরানা বা স্কুলিংএর উপস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হয় না। আবার কালের নিয়মে এই আঙ্গিকের মধ্যেও বিবর্তন ঘটেছে। যেমন বীরভূম জেলার পটের আলংকারিক বৈশিষ্ট্য হল 'পদ্মজলের' কাজ। সারা পটজুড়ে এই পদ্মজল ছড়ানো থাকে। এর নকশা তৈরি সাদা বা হলুদ বিন্দুর গুচ্ছ দিয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে পদ্মজলের এই আলংকারিক ব্যবহারের অতিরিক্ত প্রয়োগে নান্দনিক উৎকর্ষের হানি ঘটে। জড়ানো পট ছাড়াও চৌকো পট তৈরিতে বীরভূম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

গুরূসদয় দত্ত ১৯৩১ সালে বীরভূমের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে পটুয়াদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, পট অঙ্কন প্রণালী, তাঁদের রচিত গান প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি লিখেছেন, 'পশ্চিমবাংলার রাঢ় প্রদেশের পটুয়াদের অঙ্কিত জড়ানো পটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্তমান বাংলার দুইএকজন শিল্পী ও শিল্পরসিক তখনও অবগত ছিলেন বটে, এবং ইহাদের চিত্র শিল্পের প্রকৃত মূল্যের সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই তখন ধারণা ছিল; কিন্তু এই শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের অতি অল্প লোকই অবগত ছিলেন। বিশেষ করিয়া এই পটুয়াগণ পটচিত্র অঙ্কন ছাড়াও যে কাব্য রচনা করিয়া সেগুলি গাহিয়া চিত্রপ্রদর্শন করিতেন এবং সেই কাব্য গুলিরই যে সাহিত্য হিসাবে সবিশেষ মূল্য আছে তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সমাজ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।' তিনি বিভিন্ন পটুয়াদের কাছ থেকে তাঁদের তিনচার পুরুষ আগেকার থেকে আরম্ভ করে বর্তমান শিল্পীদের শত শত পট ও তাদের রচিত গানও সংগ্রহ করেন। একশো বছর আগে বীরভূম জেলার যেসব গ্রামে পটুয়াদের দেখা পাওয়া যেত সেগুলি হল– জানকীনগর, কামালপুর, রুদ্র নগর, কলিঠা, ঝাউপাড়া, সরধা, আয়াস, বোনতা, বসোয়া, বিষ্ণুপুর, চাঁদ পাড়া, সাহাপুর, ষাট পলসা, তারাচি, কানাচি, শিবগ্রাম, দাদপুর, কুণ্ডলা, পুরন্দরপুর, পানুরিয়া, ইটাগুড়িয়া, পুনিদপুর, পহিয়াড়া, কুলতোড়ে, মেজেয়া, দিঘা, বাগডোলা, সুপুর, বলভপুর, পাকুড়হাস প্রভৃতি। বলাবাহুল্য, এই তালিকা এখন ইতিহাসের পাতায়। ১৯৫৪-'৫৫ সালে বিনয় ঘোষকৃত সমীক্ষায় দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীর শুরূতে ৯০০ঘর লোক কমে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০ ঘরে। ১৯৬৯-'৭০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৬০ ঘরে এবং ১৯৮০-'৮১ সালে স্মরজিৎ দত্তকৃত সমীক্ষায় সেখানে ১০ঘর পটুয়ার দেখা পাওয়া যায় যাঁরা কখনওসখনও পটের কাজ করেন। বর্তমান গবেষক ২০০২-'০৩ সালে বীরভূম জেলার ষটপলসা গ্রামে বাঁকু ও তাঁর পুত্র শান্তনু চিত্রকর, চাঁদ পাড়ায় কালাম পটুয়া (যাঁর আদি বাসস্থান মুরশিদাবাদের ঝিলি-গ্রাম) এবং হাট সেরান্দিতে গুরুপদ, মানিক ও রামকৃষ্ণ সূত্রধর ছাড়া আর কারো খোঁজ পাননি, যাঁরা পট এঁকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এঁরাও আবার পরবর্তী প্রজন্মকে এই কাজে আনতে উৎসাহী নন। তাহলে আরো ২০৩০বছর বা দে কি গোটা বীরভূম জেলা পটুয়াশূন্য হয়ে যাবে?

পটুয়াদের অঙ্কন রীতি অনুযায়ী মুরশিদাবাদ জেলার পটুয়াদের প্রধানত দু'টি ঘরানায় ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমটি কান্দি ঘরনা। দ্বিতীয়টি গণকর ঘরানা। মুরশিদাবাদের কান্দি মহকুমা ও তার সন্নিহিত বীরভূমের নলহাটি প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়ারা কান্দি ঘরানার শিল্পী। এই ধারা এখন জীবন্মৃত অবস্থায় ধুঁকছে। গণকর ঘরানা অধুনা অবলুপ্ত। গণকর ঘরানার অঙ্কনরীতি কান্দি ঘরনার চেয়ে অনেক উন্নত ছিল বলে মনে করেন পুলকেন্দু সিংহ। গুরুসদয় মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ম ও ব্রিটিশ মিউজিয়মের মুরশিদাবাদের পটগুলি গণকর রীতির। এতে উন্নত রাজস্থানী প্রভাব ও মোগল দরবারের প্রভাব পড়েছে। ঔরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁর দরবারের যেসব শিল্পী অন্যান্য রাজন্যবর্গের আশ্রয়ের সন্ধানে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের একটি দল মুরশিদাবাদের নবাবের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার আশায় সুদূর বাংলাদেশে চলে আসেন। ১৭৬৩ খ্রি. মির কাশিমের পরাজয় ও পলায়নের পরে মুরশিদাবাদ দরবারের চিত্রচর্চা দ্রুত ক্ষয়ের দিকে যেতে থাকে। স্থানীয় লোকশিল্পী অর্থাৎ পটুয়াদের বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন মুরশিদাবাদী কলমে সঞ্চারিত হয়েছিল তেমনি মুরশিদাবাদের গণকর রীতির পটে দরবারি প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল।

মুরশিদাবাদ জেলার পটের পশ্চাদ্‌ভূমি অধিকাংশ লাল রঙের। মুখগুলি সামনে থেকে চিত্রিত। অলংকারের ব্যবহার কম। অল্প খয়েরি রং ব্যবহৃত। সবুজ ও নীল রঙের ব্যবহার বেশি। গোরুর পালন পটে গোরুগুলি পূর্ণাঙ্গ চিত্রিত। প্রতিটি ফলকের বর্ডার ৪৫ থেকে ৫০ সেমি এবং লম্বায় ৪৫০ সেমি মত হয়। চরিত্রগুলির দৃষ্টি একটু স্বপ্নালু। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে টানা টানা চোখ। তবে তা কখনোই কালীঘাট পটের মত আকর্ণবিস্তৃত হয় না।

বাঁকুড়া জেলার একাধিক স্থানে এককালে পটুয়াদের বাস ছিল। আজ তাদের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের পটুয়া পলীটি দেখলেই এ সত্য প্রতিভাত হবে। বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সাঁওতাল। তাদের বসবাস প্রধানত দামোদর ও কাঁসাইয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি গ্রাম এবং পরকুলের কাছাকাছি একটি জায়গা থেকে সুহৃদকুমার ভৌমিক এবং ডেভিড জন মাককাচ্চন যৌথভাবে পট সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু আজ আর সেখানে কেউ পট আঁকেন না। দাদপুর, ওন্দা প্রভৃতি গ্রামেও কাউকে আর পটুয়াদের তুলি ধরতে দেখবেন না। কেবলমাত্র বিষ্ণুপুরে শাঁখারি বাজারে ক'ঘর পটুয়া শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এঁদের রাজ প্রদত্ত উপাধি 'ফৌজদার'। এঁরা পূর্বে বিষ্ণুপুরের মলরাজাদের সেনাপতি ছিলেন। স্মরজিৎ দত্তর মতে, বাঁকুড়ার পটে দু'টি মূল ধারার দেখা পাই আমরা। প্রথম ধারায় দাদপুর ও বিষ্ণুপুরের ফৌজদার শিল্পীদের আঁকা পট– যেখানে নিখুঁত এবং সূক্ষ্ম রেখা ও রঙের

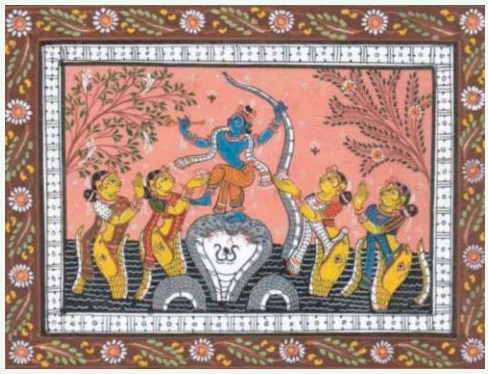

কাজের দিকে ঝোঁক, অন্যদিকে রয়েছে সাদামাটা লৌকিক ধরন, যার মধ্যে প্রায়শই রেখা ভাঙা ভাঙা কম্পোজিশানে মাত্রিকতা যোগ করার চেষ্টার অভাব। প্রথম রীতির পটের এক বিশিষ্ট উদাহরণ আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত দশাবতার পটটি। এখানে শুধু রেখা ও রঙের প্রতি মনোযোগী শিল্পীরই দেখা মেলে না, এক্ষেত্রে শিল্পী প্যানেল বিভাজনেও নতুনত্বের সন্ধানী হয়েছেন। ফৌজদারদের আঁকা ওন্দা গ্রামের মালোদের দেখানো এই পটের প্যানেলগুলি পরিচ্ছন্নভাবে ভাগ করা, সেই প্যানেলগুলিও আবার পুনর্বিভাজন হয়েছে, যার ফলে কাজের সূক্ষ্মতার মাত্রা যোগ হয়েছে পটে। বিষ্ণুপুরের ফৌজদারেরা আবার দশাবতার তাস ও নকশা তাস তৈরি করতেন, যা বাংলার চিত্রশি ল্পের এক বিরল নিদর্শন। সাবলীল অথচ বলিষ্ঠ রেখা বিন্যাসে পরিস্ফুট মূর্তিগুলি বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল; বিচিত্র রঙের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়নলোভন ব্যবহার খুব কমই চোখে পড়ে।

পটের প্রচলন বহুল পরিমাণে বিগত শতাব্দীতে মল-রাজধানীতে ছিল– আজও রাজাদের দুর্গাপূজায় পটের প্রচলন আছে। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে আঁকেন তিনটি পট। যথা– ১. বড়ো ঠাকুরানি, ২. মেজো ঠাকুরানি ও ৩. ছোট ঠাকুরানি। লোকায়ত বাঁকুড়ার লোকশিল্প 'পট' একদা সারা বাংলা, বিহার, ওড়িশাসহ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুমারটুলি, কালীঘাট পটের সঙ্গে পালস্না দিয়ে বাঁকুড়ার পটও বিচরণ করত আবিশ্বে। তখন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের পটচিত্রকে বলা হত 'বেলেতোড়ি পট' এবং বিষ্ণুপুরের পটচিত্রকে 'বিষ্ণুপুরি পট'। বাঁকুড়ার জড়ানো পটের প্রধান হল 'যমপট।' এ ছাড়া জগন্নাথবলরামসুভদ্রা পট, সিঞবোঙা, জাহের এরা, মারাং বুরু পট, পাপীর বিচার, পাপপূণ্য পট, দুর্গাপট, লক্ষ্মীপট, মনসাপট, কৃষ্ণলীলা পট, দশাবতার পট ইত্যাদি পটুয়ারা আঁকেন নিজস্ব শৈলীতে।

পুরুলিয়া জেলার গোড়্ডি, বনবহাল, জাতুরি, নেতুরিয়া, রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে আজ থেকে ত্রিশচলি শ বছর পূর্বে দশবা রো ঘর পটুয়া বাস করতেন। আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই। পুরুলিয়ার পটুয়ারা আদিবাসী পট অঙ্কনে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আদিবাসীদের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন রকম কাহিনি তাঁদের পটে স্থান পেত। এছাড়া পূর্বের মত এখনও প্রচলিত আছে চক্ষুদান পট। পুরুলিয়ার পটে খয়েরি রঙের প্রাধান্য, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাদা রং। পশ্চাদ্‌ভূমি সাদা বা খড়িমাটি রঙের, চিত্রগুলি দ্বিমাত্রিক, কারুকার্যহীন, আদিম লক্ষণাক্রান্ত, সীমানা বা বর্ডার প্রায়শই অনুপস্থিত। যে সব পটে বর্ডার আছে তা কালি দিয়ে তুলির সাধারণ টান মাত্র। চিত্রের মুখগুলি পাশ থেকে আঁকা। ফলে স্বাভাবিকভাবে তা একচক্ষু বিশিষ্ট। দু-চোখ আঁকা অর্থাৎ সামনে থেকে আঁকা ছবির পরিমাণ কম। ছবিগুলিতে রঙের বৈচিত্র্য নেই। পট লম্বায় ৯০ সেমি এবং চওড়ায় ১৬৯৮ সেমির মত হয়। পুর ুলিয়ার পটে চরিত্র সংখ্যা এক থেকে তিন। মেদিনীপুরের পটের মত চরিত্রের সংখ্যাধিক্য নেই। খুব পাতলা কাগজ, কখনও ঠোঙার কাগজের উপরেও আঁকতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাই এর মূল কারণ।

হাওড়া জেলায় ১৯২০ শত কে যেসব অঞ্চলে পটুয়ারা বাস করতেন সেগুলি হল– প্রশস্থ, লিলুয়া, কুরচি, চণ্ডীপুর ইত্যাদি। এঁদের তৈরি পট বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে। হাওড়া জেলার পটে আঁকা শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনকাহিনি, বেহুলালখী ন্দরের পালা, কমলেকামিনীর কাহিনি, শিব মাহাত্ম্য, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় ছিল। চণ্ডীপুর গ্রামের পটুয়া সমাজের মধ্যে যোগেন চিত্রকর ছিলেন এক দক্ষ অঙ্কনশিল্পী। তাঁর আদি নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার আজুড়িয়াপলসপাই গ্রাম। পিতা পরাণচন্দ্রও ছিলেন একজন পটশি ল্পী। জীবিকার তাগিদে যোগেন চিত্রকর তাঁর কাকার সঙ্গে নিজ গ্রাম ত্যাগ করে চণ্ডীপুরে চলে আসেন। পরবর্তীসময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা উমেশ চিত্রকর ও কনিষ্ঠভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনও সুযোগসুবিধার কার ণে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং উভয় ভ্রাতাই ছিলেন সেকালের কুশলী পটশিল্পী। যোগেন চিত্রকরের আঁকা কমলেকামিনী, রামায়ণ ও মনসার ভাসান প্রভৃতি বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত আছে। হাওড়া জেলার যে অঞ্চলের পটচিত্রের খ্যাতি সর্বাধিক বিস্তৃত ছিল সেই চণ্ডীপুরেও পট আঁকার ধারাটি লুপ্ত। বিখ্যাত পটুয়া প্রফল-চিত্রকরের চার ছেলেই পট না এঁকে প্রতিমা গড়েন।

আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট গ্যালারিতে ১৮শতকের গোড়ায় চিত্রিত হুগলি জেলার পটগুলির সিংহভাগই রামায়ণ অবলম্বনে আঁকা। রাম, লক্ষণ এবং রাবণের লড়াই, রামের দুর্গাপূজা ইত্যাদি ছিল জনপ্রিয় বিষয়। হুগলির পটুয়াদের পছন্দ ছিল ঘন পিঙ্গল বর্ণ। নদীর রং ঘোলাটে কিংবা ধূসর নীল। গঙ্গার সমভূমি প্রবাহের ছায়াপাত যেন। এই জেলার তালচিনান, গুড়াপ, গোপীনাথপুর, জলঘাটা, ত্রিবেণী, পুইনান প্রভৃতি অঞ্চলে পটুয়া বসতি ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপদ থেকেই কলকাতার নগর সভ্যতার আহ্বান, সুযোগসুবিধা এবং স্থানীয় বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ঘটনাধারা লোকসমাজকে প্রভাবিত করতে থাকে। এর ফলে স্থানীয় কৃষিকেন্দ্রিক চরিত্র ও গ্রাম্য সামাজিক চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়।

আক্ষেপের বিষয় বর্তমানে বিভিন্ন চিত্রশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে যেসব পটচিত্রের সাক্ষাৎ মেলে সেগুলির মধ্যে প্রাক্‌বিংশ শত কে সৃষ্ট নিদর্শন একান্ত দুর্লভ। অল্পসংখ্যক কিছু পটই উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বলে নির্ণয় করা যেতে পারে। আশুতোষ সংগ্রহশালার প্রাক্তন কিউরেটার নিরঞ্জন গোস্বামীর মতে, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি ক্ষণজীবী উপাদানে প্রস্তুত হওয়ার দরুণ প্রাচীনতর নিদর্শনগুলি সবই নিশ্চিহ্ন। ফলে বস্তুগত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে পটচিত্রের উৎপত্তির কাল থেকে আধুনিক পর্ব পর্যন্ত এই চিত্র রচনাভ্যাস ও বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস সঠিকভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ গবেষক মাত্রেই জানেন ঊনবিংশ ও বিংশশতকে বাংলার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে হলে এই পটচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন পটগুলি আমাদের সমাজ ইতিহাসের দলিল ও জাতীয় সম্পদ। গুরুসদয় দত্ত তাঁর পটুয়া কবিতায় যথার্থই আক্ষেপ করেছিলেন:

ইচ্ছে করে আমার এদের
কোলে টেনে লয়ে;
ক্ষমা মাগি আমার মূঢ়
জাতির পক্ষ হয়ে।

ড. সুমনা দত্ত চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রাবন্ধিক

অনুবাদ গল্প

সতী-চরিতামৃত

কিশোরীচরণ দাস

আমি পদ্মাকে অনর্থক বকলাম। যা মনে এল তাই বলে গেলাম। বোধহয় বিয়ে হয়ে ইস্তক এমন করে কখনো বলিনি, কিন্তু ও আমায় রাগিয়ে দিল কেন? এত সতীপনা দেখাতে কে বলেছিল ওকে?

লম্বা লম্বা পা ফেলে পথ চলতে চলতে শ্যামঘনবাবু ক্রমশ অনুতপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। মিনিট দশেক হবে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না। সোজা বড় রাস্তায় এসে কলেজের কাছে বাঁহাতি রা স্তা ধরে 'বনিয়া সাহি'(বেনে পাড়া)র মাঝখা নে চলে এসেছেন। এইখানে তাঁকে দু'এক মুহূর্তের জন্য চারিদিকে তাকাতে হল। কারণ এখানে ভোটারসংখ্য া বেশি।... এইখানে কয় মাস আগে নির্বাচনী সভাম-পে শ্যামঘন চৌধুরী সনাতন মহান্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলেন।... স্মৃতির গ্লানি তাঁকে পীড়া দিতে লাগল, তিনি গতি দ্রুততর করলেন। কেউ দেখলে দেখুক, আমি পরোয়া করি না। আমি যেমন ভাল বুঝব তাই তো করব, ভোটাররা কি আমায় স্বর্গে নিয়ে যাবে?

> আঃ কী চমৎকার হাওয়া! কী সুন্দর দৃশ্য! শ্যামঘনবাবু নতুন রাস্তার নূতনত্বকে, তার অভিনব মাধুর্যকে তাঁর শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে দিলেন এবং অনুপস্থিত লাঞ্ছিতা পদ্মাদেবীকে মনে মনে আহ্বান করলেন– এস, দেখ। শ্যামঘনবাবু একা একাই হাসলেন ও রুমালে মুখ মুছলেন। দূর থেকে দেখলেন বা আন্দাজ করলেন যেন সর্বমঙ্গল পার্টির তিনতলা হল দে বাড়িটা উঁকি মারছে।

বনিয়া সাহি ছাড়িয়ে শহরতলির খোলা রাস্তায় এসে পড়ার পরে শ্যামঘনবাবু এক অপূর্ব পুলক অনুভব করলেন এবং আবার পদ্মাদেবীকে স্মরণ করলেন।... পদ্মা বোকা মেয়ে, নেহাত বোকা। বোঝে না যে সত্য ও সংস্কার দুটো আলাদা জিনিস। জানে না সাইকোলজি কবে থেকেই সংস্কারের গিট খুলে দিয়েছে। –আঃ কী চমৎকার হাওয়া! কী সুন্দর দৃশ্য! শ্যামঘনবাবু নতুন রাস্তার নূতনত্বকে, তার অভিনব মাধুর্যকে তাঁর শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে দিলেন এবং অনুপস্থিত লাঞ্ছিতা পদ্মাদেবীকে মনে মনে আহ্বান করলেন– এস, দেখ। শ্যামঘনবাবু একা একাই হাসলেন ও রুমালে মুখ মুছলেন। দূর থেকে দেখলেন বা আন্দাজ করলেন যেন সর্বমঙ্গল পার্টির তিনতলা হল দে বাড়িটা উঁকি মারছে।

...এই রাস্তায় এক আধ বার না এসেছি এমন নয়। গাড়িতে চড়ে নিজের পার্টির পতাকা উড়িয়ে এসেছি। লাউড-স্পিকার গর্জে উঠেছে যেন ঐ ঘৃণিত হলদে বাড়িটাকে ধূলিসাৎ করে দেবে। কিন্তু এইভাবে আসিনি, এমনি রাগের মাথায় হেঁটে হেঁটে আসিনি। শ্যামঘন আর এক বার একা একা হাসলেন ও রুমালে মুখ মুছলেন।

...আমি খালি শুনে যাব। সহজে ধরা দেব না। আমার কাউকে বিশ্বাস নেই। সনাতন মহান্তি যা ধরণী মহাপাত্রও তাই! নেতা বাহাদুর যা রায় বাহাদুরও তা! সবাই চোর, গলাকাটা...

পুলক উবে যাচ্ছে? সোহাগ শুকিয়ে যাচ্ছে? না। শ্যামঘনবাবু নিজেকে বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি প্র্যাকটিকাল।... আমি আপন শখেই নতুন রাস্তায় চলেছি। আমায় কেউ জোর করছে না। আমি জেনে শুনেই রোমাঞ্চ তৈরি করছি– নইলে মজা লাগবে কেন? প্রেম প্র্যাকটিকাল, সেক্স প্র্যাকটিকাল। পলিটিক্স প্র্যাকটিকাল। ফিরে গিয়ে আমি পদ্মাকে আতিপাতি করে বুঝিয়ে দেব। সে বুঝবে যে আমরা স্বামী-স্ত্রী, কাঁদবার জন্য জন্মাইনি।

সনাতন মহান্তি বুঝবে। হাড়ে হাড়ে বুঝবে!...

এইভাবে উত্তেজিত, উত্তপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয়ে শ্যামঘনবাবু চললেন এবং বারংবার রুমালে মুখ মুছলেন। হলদে বাড়িটা ক্রমশ স্পষ্ট দেখা গেল এবং সেই অনুপাতে তাঁর গতিবেগ কম হয়ে এল। তিনি হাতঘড়ি দেখলেন। সাড়ে দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। তা হোক, আমাকে আগে গিয়ে পৌঁছতে হবে বলে কি কোথাও লেখা আছে? ধরণী মহাপাত্র বলছিল বিভিন্ন দলের বাছা বাছা সাত আট জন আসবে। ধরণী মহাপাত্র ফোনে হেঁঃ হেঁঃ করে হেসে বলেছিল (ওর হাসি শুনলে আমার রাগ ধরে)– আমাদের হাতেই চাবি, বুঝলেন চৌধুরীমশায়, আমাদের হাতেই চাবি। লোকটা গুণ্ডা, কিন্তু তার হাতে অজস্র টাকা। ইচ্ছে করলে সারা শহরটা কিনে নিতে পারে।

কারা সব আসবে? স্বাধীন নাগরিক দলের পক্ষ থেকে শেঠ বংশীলাল? দলিত সংঘের তরফ থেকে কৃষ্ণ পাঢ়িয়ারী? দেশমাতৃকা ফ্রন্ট থেকে রায় বাহাদুর নারায়ণ রায়? আসুন, সবাই আসুন, আমি প্রস্তুত।

মিটিংয়ের দেরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্যামঘনবাবু রাস্তার ধারে বসে থাকা এক বুড়ির কাছ থেকে বৈঁচি ফল কিনলেন। বৈঁচি কি আর কিছু তা অবশ্য তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না, তবে মুখে ভালই লাগল, আরো খেতে ইচ্ছে হল।

...আমার কোন কিছুর জন্য ব্যাকুলতা নেই, পদলালসা নেই। আমি মিটিংয়ে যাচ্ছি আমার পাওনা আদায় করতে। আমায় যেতে কেউ বাধ্য করছে না। আমার ইচ্ছে হলে আমি আরো দশ মিনিট এইভাবে বসে বৈঁচি খাব, বুড়ির সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা কইব। বৈঁচি খেতে আমি ভালবাসি। পদ্মাকে বকাবকি করলাম, কিন্তু আমি ওকে কত ভালবাসি। আমি ভগবানের এই সুন্দর পৃথিবীকে ভালবাসি। কিন্তু– কিন্তু (তিনি নিজে নিজেই লাগাম টানলেন) সেখানে সনাতন মহান্তি নেই। পূর্ণচ্ছেদ।

ঠিক এই সময়ে একটা সবুজ মোটর গাড়ি সবেগে তাঁর কাছ দিয়ে চলে গেল। শ্যামঘনবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালেন, চেনা গাড়ির গন্ধ পেলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে খুব নজর করে দেখলেন, কিন্তু ধুলোর মধ্যে দ্রুত অপসৃয়মাণ গাড়ির নম্বর ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না।

কে? কে এই সময়ে ধুলো উড়িয়ে আমার যাবার রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল? কোথায় যাচ্ছে?

শ্যামঘনবাবু বৈঁচি খাওয়া বন্ধ করে শূন্য রাস্তার দিকে চেয়ে থাকলেন। তাঁর মনে হল নিশ্চয় কেউ জেনেশুনে তাঁর যাবার পথ দিয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করে চলে গেল। যেন শ্যামঘনবাবুকে লুকিয়ে লুকিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে দেখে মোটরে চেপে নিজের দেখনদারি করে গেল।

আর কে এমন করে বুক ফুলিয়ে ধুলো উড়িয়ে যেতে পারে? ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারে? চেনা সবুজ গাড়ি আর কার...?

কিন্তু সে সরকারি গাড়ি ছেড়ে তার নিজের গাড়িতে ঘুরছে কেন? না না, অসম্ভব, আমায় কি ভূতে পেয়েছে নাকি?

শ্যামঘনবাবু শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন। ভূত ছাড়াতে পারলেন না, কারণ হলদে বাড়িতে পৌঁছে ধরণী মহাপাত্রর সঙ্গে করমর্দন করা মাত্রই তিনি দেখতে পেলেন যে সবুজ অ্যাম্বাসাডারের মালিক এসে বসে আছে। জাঁকিয়ে বসে পাইপ টানছে।

সে আছে। ভূত নয়, মানুষ। খোদ মুখ্যমন্ত্রী সনাতন মহান্তি, শত্রুপক্ষের মিটিংয়ে বসে ধোঁয়া ছাড়ছে!

সকলেই শ্যামঘনবাবুর কেমন একটা বিমূঢ় ভাব লক্ষ করল। আর ধরণী মহাপাত্র তার সবটুকু মজা পাবার জন্যই যেন উচ্চ রবে হেসে উঠলেন। বললেন, কি চৌধুরী মশায়, বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি কি ভেবেছিলেন আমি আমাদের বিশিষ্ট নেতা, দেশভক্তের শিষ্যকে ভুলে যাব?

হাসির রোল উঠল। শ্যামঘনবাবুর মুখও হাঁ হয়ে গেল। কিন্তু চেয়ারে বসার আগে তাঁর মনে এক বালসুলভ অথচ প্রণয়ের ভাব উদয় হল, আমি পদ্মার কাছে ফিরে যাব!

দুই.

পদ্মা দেবী বাড়িতে বসে কাঁদছিলেন না। স্বামীর আকস্মিক ও কল্পনাতীত কঠিন কথায় তিনি অবশ্য ভয় পেয়ে

হলদে বাড়িটা ক্রমশ স্পষ্ট দেখা গেল এবং সেই অনুপাতে তাঁর গতিবেগ কম হয়ে এল। তিনি হাতঘড়ি দেখলেন। সাড়ে দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। তা হোক, আমাকে আগে গিয়ে পৌঁছতে হবে বলে কি কোথাও লেখা আছে? ধরণী মহাপাত্র বলছিল বিভিন্ন দলের বাছা বাছা সাত আট জন আসবে। ধরণী মহাপাত্র ফোনে হেঁঃ হেঁঃ করে হেসে বলেছিল (ওর হাসি শুনলে আমার রাগ ধরে)– আমাদের হাতেই চাবি, বুঝলেন চৌধুরীমশায়, আমাদের হাতেই চাবি।

স্বামী কাছে নেই, তবে স্বামীর ফটো আছে। জেলে যাওয়ার আগের ফটো। বিনয়নম্র চাউনি। হাসি হাসি মুখ। যেন জেলে যাওয়ার আনন্দে দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। এমন লজ্জাশরম কম ওঁর, জেল থেকে ফিরে ঘরে পা দিতে না দিতেই কি করলেন মনে আছে? সকলের সাক্ষাতে... আমায় ইশারায় চুমু দিলেন...! ধুর, তখন তাঁর ছোকরা বয়স, এখন তো মাঝবয়সী। তখন ছেলেমানুষ ছিলেন, এখন বড় হয়েছেন।... পদ্মাদেবী বর্তমানে ফিরে এলেন।

গিয়েছিলেন এবং থেকে থেকে 'তোমার কী হয়েছে?' 'তোমার কী মাথা খারাপ', 'ওঃ ভগবান!' প্রভৃতি নিরর্থক মন্তব্য করেছিলেন কিন্তু স্বামী রাগ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তাঁর মনে হল যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

তিনি বার বার নিজেকে বললেন– আমার স্বামী একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি রাগ করতে পারেন, বকাবকি করতে পারেন, কথা কাটাকাটি তর্কাতর্কি করতে পারেন কিন্তু তিনি নীচ নন। আমার সম্বন্ধে তাঁর এমন নীচ ধারণা আছে এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।

তিনি শান্ত লোক, কিন্তু মাঝে মাঝে পাগলের মত রেগে যান। আমি কি আজ নতুন দেখছি?

আমার মনে আছে একবার তিনি তাঁর বাবাকে বলেছিলেন– আপনারা মানুষ নন, ভেড়া।

একবার তাঁর ডাক্তার বড়দাকে বলেছিলেন– তোমরা সব কসাই।

তিনি কড়া কড়া কথা বলেন যখন তাঁর প্রাণ কাঁদে। দীনদুঃখীর জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য। আমি কি জানি না?

আজ তিনি বাস্তবিক আমার উপরে রাগ করেননি। তাহলে? পদ্মাদেবীর ইচ্ছা হল তিনি চার হাত লম্বা তাঁর স্বামীকে কাছে টেনে এনে দুই হাতে তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসা করেন– প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে দেন– বল, তোমায় আমার দিব্যি, বল তুমি কার ওপরে রাগ করেছ। আমার মুখের দিকে তাকাও। আমি ছাড়া আর তোমায় কে বুঝবে বল তো?

স্বামী কাছে নেই, তবে স্বামীর ফটো আছে। জেলে যাওয়ার আগের ফটো। বিনয়নম্র চাউনি। হাসি হাসি মুখ। যেন জেলে যাওয়ার আনন্দে দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। এমন লজ্জাশরম কম ওঁর, জেল থেকে ফিরে ঘরে পা দিতে না দিতেই কি করলেন মনে আছে? সকলের সাক্ষাতে... আমায় ইশারায় চুমু দিলেন...! ধুর, তখন তাঁর ছোকরা বয়স, এখন তো মাঝবয়সী। তখন ছেলেমানুষ ছিলেন, এখন বড় হয়েছেন।... পদ্মাদেবী বর্তমানে ফিরে এলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল যে নেতাদের বড় হওয়া উচিত নয়। বড় হলে তাদের চেহারা বদলে যায়, তোমার আমার মতই দেখায় তাঁদের তখন। না, তোমার আমার মত নয়, সনাতনবাবুর মত!

সনাতনবাবুকে দেখলে ভয় করে। মানুষটি ছোটখাট, চুল পেকেছে, আস্তে আস্তে কথা বলেন। তবু কী জানি কেন তাঁকে দেখলে ভয় করে যেন কোন বড়মাথাওলা জন্তু তার ঠোঁট চাটছে... খিদে, আরো খিদে...।

আতঙ্কে পদ্মাদেবী আজকের ঘটনা অর্থাৎ স্বামীর ভৎর্সনার কথা মনে করলেন। চাইলেন, স্বামীকে– স্বামীর প্রত্যেকটি লাইন– বইয়ের মত করে পড়ে দেখবেন, পুরোপুরি বুঝে নেবেন। বুঝে নেবেন যে তাঁর স্বামী (আমার শ্যাম, আমার গোরা কানু) অমন নন।

তখন তিনি স্মরণ করলেন...

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমিই প্রথমে শুরূ করলাম– অসতীদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা উচিত।

উনি মৃদু মৃদু হেসে বললেন– উত্তম।

– এই দেখছ না খবরের কাগজে বেরিয়েছে! এত বড় লোকের স্ত্রী, চার ছেলেপিলের মা, সে কোন সিনেমা-অ্যাক্টরের সঙ্গে–

তর্কের ভঙ্গিতে উনি বললেন, হল কী তাতে? একজনকে আর মন চাইল না, আর একজনের কাছে গেল। এ তো সৃষ্টির নিয়ম।

– কুকুর-বেড়ালের নিয়ম, মানুষের নয়।

উনি হো হো করে হাসলেন। আর এক কাপ চা আনালেন। আমি ভাবলাম তর্কটা বেশ জমেছে কিন্তু উনি হঠাৎ থেমে গেলেন। হাতঘড়িতে সময় দেখে বললেন– আমায় তাড়াতাড়ি কী খেতে দেবে দাও, আমি বেরব।

তারপরে কী হল? আমি তো আর কিছু বলিনি কিন্তু দেখলাম উনি এক এক বার দু'হাতের আঙুলে আঙুল ছাঁনছেন। চায়ের কাপটাকে এমন মুঠো করে ধরছেন যেন ভেঙে চুরমার করে ফেলবেন। আমায় যেন কখনো দেখেননি এমনিভাবে আমার দিকে জ্বলজ্বল করে চাইছেন।

উনি ঠোঁট কামড়ে 'ননসেন্স' বলবার আগেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে উনি রাগ করছেন। রাগ করছেন ও কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু কেন?

উনি আমায় সময় দিলেন না। প্রচ- বেগে উদ্গীরণ করলেন– পৃথিবীতে ক'টা সতী আছে? তুমি সতী? তোমার ভেতরকার মনটাকে খুলে বল দেখি?

আমি কাঠ হয়ে গেলাম।

– কি বলতে ভয় করছে? লজ্জা করছে? বঝলে, সতীপনা শুধু একটা ঢঙ। তুমি আমায় জাপটে ধরে আছ কেন না তোমার অন্য উপায় নেই। বেচারী!... বিদ্রূপ করলেন আমায়।

কত রঙ্গই জানেন! নইলে আর কিসের নেতা? তার পরেই গলার সুর বদলে বললেন কী না– আমি তোমাকে অনুমতি দেব, আমায় বিশ্বাস কর। আমি মুর্খ নই। আমি জানি যে একটি লোকের সঙ্গেই পড়ে থাকায় কোন বাহাদুরি নেই। তাতে পেট ভরে না, মন ভরে না। বল কার কাছে যাবে।

আমি আর সইতে পারলাম না। বললাম, ওঃ! চুপ করবে কি না?

– কেন চুপ করব?– বলে উনি ওঁর তেজ দেখালেন। – আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না। আমি নাবালক নই। আমি দুনিয়াটাকে দেখে নিয়েছি। আমার যা ইচ্ছে হবে করব। পুরনোকে ছাড়ব, লাথি মেরে ফেলে দেব। আর তোমার ঐ সব ভ- সতীদের অপমান করব। আমি শ্যামঘন চৌধুরী! আমি কারোর বাঁধা নই। বুঝলে?

এমনি উনি কত কী বলে গেলেন তার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। কিন্তু ওঁর শেষ কথাটার মধ্যে রাগ ছিল না। এতক্ষণ উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়তো পায়চারি করতে করতে লেকচার দিচ্ছিলেন। এখন ধপ করে চেয়ারে বসে

আজকের ঘটনাটা ভাল করে উলটেপাল টে দেখার পর পদ্মাদেবীর খেয়াল হল যে তাঁর স্বামীর এই একরোখাপনা এক মাস কি দু'মাস হল দেখা দিয়েছে। বোধহয় এই নতুন মন্ত্রিসভা গড়া ইস্তক, সনাতন মহান্তি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই। কে জানে! হ্যাঁ, তখন থেকেই উনি কথায় কথায় রাগ করছেন। খেতে বসে, প্রেম করতে করতে, ছোট ছেলে চন্দুর সঙ্গে বল খেলতে খেলতে উনি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন আর খানিক পরে ছিরকুটে রাজনীতি নিয়ে টিপ্পনি করছেন।

পড়ে ক্লান্ত সুরে বললেন– যাক গে, তোমাকে বলে লাভ নেই। আমি একলাই যাব।

আমি ওঁকে বলতাম– শোন, তুমি একলা নও। আমি তোমার পাশে পাশে আছি। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে বল, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি। আমি অসতী নই। তুমি আমার পুরুষ মানুষ, তুমি আমার নেতা। তুমি যখন কারও কথা না শুনে সেক্রেটারিয়েটের উপরে পার্টির পতাকা ওড়াতে গেলে, কে তোমার পাশে পাশে ছিল? প্রথম ভোটের লড়াইয়ের সময় কে তোমার হাতে গয়না বেচা টাকা গুঁজে দিয়েছিল? মনে আছে (পদ্মাদেবীর ঠোঁটে আমোদের হাসি দেখা দিল), তুমি যখন অনশন সত্যাগ্রহ করেছিলে আমি কেমন লুকিয়ে তোমায় একটা রসগোল্লা খাইয়ে দিয়েছিলাম?

বলতাম, কিন্তু বলতে পারলাম না, উনি হঠাৎ উঠে চলে গেলেন। বললেন, আমার কাজ আছে, আমি যাচ্ছি, খাবার সময় নেই।

আজকের ঘটনাটা ভাল করে উলটেপাল টে দেখার পর পদ্মাদেবীর খেয়াল হল যে তাঁর স্বামীর এই একরোখাপনা এক মাস কি দু'মাস হল দেখা দিয়েছে। বোধহয় এই নতুন মন্ত্রিসভা গড়া ইস্তক, সনাতন মহান্তি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই। কে জানে! হ্যাঁ, তখন থেকেই উনি কথায় কথায় রাগ করছেন। খেতে বসে, প্রেম করতে করতে, ছোট ছেলে চন্দুর সঙ্গে বল খেলতে খেলতে উনি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন আর খানিক পরে ছিরকুটে রাজনীতি নিয়ে টিপ্পনি করছেন। টিপ্পনি করতে করতে সনাতন মহান্তিকে গাল দিচ্ছেন, বলছেন তার জন্যেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল।

আগে কথা ছিল– আমিও ভাবছিলাম অন্যেরাও ভেবেছিল– যে উনি মন্ত্রী হবেন। ওঁকে কে না ভালবাসে? যত স্কুলক লেজের ছেলে-ছোকরা, যত বাড়ির বউঝি তাঁর রূপগুণে মুগ্ধ (আমার হিংসে হওয়ার কথা!) কিন্তু কী হল কে জানে নতুন মন্ত্রিসভায় তাঁর নাম থাকল না। তাই কী উনি দুঃখ করলেন না? তিনি বললেন, আমার ও পদের দরকার নেই। আমি শাসন করতে চাই না, সেবা করতে চাই।

তবু সেই দিন থেকে উনি যেন কেমন হয়ে গেছেন– অস্ফুটভাবে বললেন পদ্মাদেবী।

উনি কি ভেতরে ভেতরে মন্ত্রী হতে চান?

বিদ্যুৎ চমকের মত এ কথাটা মনে হতেই পদ্মাদেবী চাগিয়ে উঠলেন, এই কথা? তাঁর যেন মনে হল যেহেতু তিনি সতী তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। অনশন সত্যাগ্রহের সময়ে স্বামীকে লুকিয়ে রসগোল্লা খাইয়ে দেওয়ার মত তিনি স্বামীর এই সামান্য সাধটি মিটিয়ে দেবেন ও তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন। মায়ের মমতা ও স্ত্রীর অভিমান দুয়ে মেশানো এক বিপুল ব্যাকুলতার স্বরে মনে মনে বলে চললেন– তুমি মন্ত্রী হতে চাও। তুমি মন্ত্রী হবে, নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে। কিন্তু তুমি আমায় এমন করে ভয় পাইয়ে দিও না! তুমি আর কারো কাছে যেও না, আর কখনো আমায় অসতী বোলো না...

তিন.

সর্বমঙ্গল সমিতির হলদে বাড়িতে শ্যামঘনবাবু খুব কম কথা বলছিলেন। প্রথমে তিনি চুপ করে বসে ছিলেন। তারপরে মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছিলেন ও দু'একটি কথা বলছিলেন। দেশের ঘোর দুর্গতি নিরূপিত ও আলোচিত হয়ে গেছে। রাজনৈতিক সঙ্কটকে আয়ত্তে আনার জন্য পন্থাপদ্ধতি নির্ণয় অর্থাৎ নতুন পার্টি গড়াও স্থির হয়ে গেছে। উপস্থিত প্রশ্ন এই যে অন্যতম মন্ত্রী ও নেতা গণপতি দলেইকে পঙ্গু করে রাখতে হলে কী করা আবশ্যক। শেঠ বংশীলাল পাশে বসে ছিলেন, তিনি শ্যামঘনবাবুর গায়ে একটা মোলায়েম ঠেলা দিলেন। রায় বাহাদুর তাঁর এজলাসে বসে যেমন বলেন তেমনি করে, 'ইয়েস? ইয়েস?' বলে প্রবর্তনা দিলেন। সকলে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে এদিকে তাকালেন। এমনকি সনাতন মহান্তির অবিরাম ধোঁয়ার কু-লী বুঝি এক মুহূর্তের জন্য থামল, বল শ্যামঘন, বল। ...গণপতি দলেই তোমার বন্ধু, সুতরাং তোমায় কিছু বলতে হবে। ...গণপতি দলেই তোমার বন্ধু; কিন্তু বন্ধুর চাইতে বড় আমাদের দেশ, বড় আমাদের জাতি– অর্থাৎ এই নবতম পার্টি। বল শ্যামঘন, বল। তুমি কেমন নেতা একবার দেখিয়ে দাও।

... বলছি, বলব। একটু সবুর কর। শ্যামঘন চৌধুরী মেনিমুখো নয়। আমি এখানে তামাশা দেখতে আসিনি। আমি পদ্মাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি জেনেশুনেই আমার পুরনো দল– দলের শেওলাপড়া বাড়ি, তার আগাছাভরা ফুলের বাগান– সব ছেড়ে দিয়েছি। বাগানের বরজু মালীকে– যে তার গুলির চোট লাগা পায়ে এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে– আর দেশভক্তের ঐ জমকালো গুঁপো মুখের ফোটোটাকে বর্জন করেছি। আমি সনাতন মহান্তির সঙ্গেই এসে মিলেছি। কিন্তু– কিন্তু শেষে 'গনিআ'কে বিদায় করতে হবে? বেশ, আমি উপায় বাতলে দিচ্ছি। একটু সবুর কর।

কিন্তু দুই বার গলা সাফ করেও তিনি উপায় বাতলাতে পারলেন না। উপরন্তু এক হাস্যকর প্রস্তাব দিলেন– গণপতি দলেইকে এই নতুন পার্টিতে যোগ দিতে বলা হোক!

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিদ্রূপের হই হই রোল উঠল। ধরণী মহাপাত্রর মুখে হতাশার চিহ্ন দেখা গেল– যেন আজকের সভাটাই মাটি হয়ে গেল, সব প্ল্যান ভেস্তে গেল।

শ্যামঘনবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। ক্রোধের তাত সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল।... আমি ভুল কী বললাম? আমি যখন পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছি গণিআ কেন যোগ দেবে না? সনাতন মহান্তির কথা বাদ দাও। আর সবার কথা বাদ দাও। আমি নিজে যোগ দিচ্ছি– গনিআ কি এটুকু বুঝবে না? এতে হাসবার কী আছে? এরা আমাকে পেয়েছে কী?

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিদ্রূপের হই হই রোল উঠল। ধরণী মহাপাত্রর মুখে হতাশার চিহ্ন দেখা গেল– যেন আজকের সভাটাই মাটি হয়ে গেল, সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। শ্যামঘনবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। ক্রোধের তাত সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল।... আমি ভুল কী বললাম? আমি যখন পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছি গণিআ কেন যোগ দেবে না? সনাতন মহান্তির কথা বাদ দাও। আর সবার কথা বাদ দাও। আমি নিজে যোগ দিচ্ছি– গনিআ কি এটুকু বুঝবে না? এতে হাসবার কী আছে? এরা আমাকে পেয়েছে কী?

কিন্তু আসল কথা তখনো শেষ হয়নি– নতুন সরকার গড়া হলে তাতে কে কী হবে, কে কোন বিভাগের মন্ত্রী হবে। আবার শুরু হল রায় বাহাদুরের এক দুই তিন। হাঁ, ধন্য বটে! কেমন মোলায়েমভাবে উনি বিনয়মধুর হাঁনা ক রেই ফুলের মালাখানি গেঁথে ফেললেন, যেন প্রত্যেকের জন্য আগে থেকে একটি করে আসন ঠিক হয়েই ছিল– ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। সেই সাবলীল অনুক্রমের জের টেনেই তিনি উচ্চারণ করলেন– ছাত্রনেতা যুবনেতা শ্যামঘন চৌধুরী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি...

শ্যামঘনবাবুর ইচ্ছা হল তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে যান, এরকম অপমান সহ্য করতে পারবেন না। তিনি চলে যাবেন, এদের বুঝিয়ে দেবেন যে শ্যামঘন চৌধুরী গণপতি দলেইয়ের চাইতে কোন অংশে কম নয়।

...'হ্যাঁরে, কী বললি?' গণপতি দলেইয়ের হাড়-বেরনো গাল, চ্যাপটা নাক, খলখল হাসি মনে পড়ল।

... 'আমি দল ছেড়ে দেব! নয়তো মন্ত্রী পদ থাকবে না? বাহবা, চমৎকার! তুই ছেড়ে দিয়েছিস? সে কী রে, কেন? তোর হল কী? পতাকা তোলার সময় তুই কি বউদির কথা ভাবছিলি? (দাঁত বার করা খলখল হাসি) ভাল, ভাল। তাহলে আমি আর কাউকে দেখি– যে আমাকে পতাকার রঙ মনে করিয়ে দেবে, ফ্রান্স আয়ার্ল্যান্ড রুশিয়াতে কী কী হয়েছিল সে ইতিহাস শোনাবে। যার সঙ্গে নদীর বাঁধে বসে মাছ ধরব, মাঠে বসে ছোলাভাজা চিবুব আর বরজুআকে খেপাব। যে আমাকে লাল সূর্য দেখিয়ে দেবে আর আমি গাধাডাকা গলায় দেশ-বন্দনা গাইলে তার সঙ্গে তাল দেবে। –কিন্তু তুই কেন ছাড়ছিস বল তো? মন্ত্রী হবি বলে?'

শ্যামঘনবাবু উত্যক্ত হয়ে উঠলেন।... গনিআ, তুই একটা মুর্খ, পদ্মার মত। কিংবা ঐ বরজু মালীর মত।

... গনিআ, তুই কি দুধের ছেলে? এইটুকু বুঝিস না যে পতাকা নিয়ে হাসলে কাঁদলে ধেই ধেই করে নাচলেই পলিটিক্স হয় না? গনিআ, তুই ছেলে মানুষ নোস, তুই নেতা! তুই নেতা! ...গনিআ, তুই কি একটা মেয়েমানুষ? পুরুষমানুষের মত কখনো ভাবতে পারিস না? তোর কি কখনো ইচ্ছে করে না পতাকাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে? এই ভেড়ার পাল ভোটারগুলোকে গুলি করে শেষ করে দিতে? সনাতন মহান্তির গলায় পা দিয়ে সিটি বাজাতে তোর লোভ হয় না কখনো?

... না, তোর সঙ্গে বকে লাভ নেই। তুই দল ছাড়বি না। ছাড়তে পারবি না। মন্ত্রী হলেই বা কি, না হলেই বা কি। মোটর চড়লেই বা কি, না চড়লেই বা কি। কারণ, তুই নিজে হচ্ছিস পতাকার রঙ। না, তুই হচ্ছিস পতাকা! সেই প্রথম যেখানে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল তারই সোঁদা-নোনতা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে জয়জয়ের সেই প্রথম গাঁজার ধোঁয়ায় টলতে টলতে... সেই একটি প্রেম সেই একটি জীবনের 'আহা'টুকু নিয়ে তাতেই মাতামাতি করে...

– আপনারা জানেন? গণপতি দলেই একটা পাঁড় মাতাল।

– অ্যাঁ, কে বলছে? কৃষ্ণ পাড়িয়ারি? শ্যামঘনবাবু চমকে উঠলেন।

– আমায় যদি বলেন তো সাক্ষীপ্রমাণ হাজির করতে পারি। আমি নিজে দেখেছি তাকে সাঁওতালদের সঙ্গে বসে হাঁড়িয়া খেতে।

এবার শ্যামঘনবাবু বুঝলেন, কিন্তু বিচলিত হলেন না। হুঁ! হাঁড়িয়া কী, ওকে তাড়ি দাও হুইস্কি দাও বিষ দাও সে সবই খেয়ে নেবে! ওর ঐ হতভাগা পার্টি-প্রেম ঐরকমই।

– যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে সে মদ খায়, সাঁওতাল ছুঁড়িদের পিছন পিছন ঘোরে, তাহলে কী হবে জানেন তো? তার পিছনে যে ক'টি ধামাধরা আছে সব সরে পড়বে, অর্থাৎ– তারা এসে আমাদের এই সংযুক্ত সর্বমঙ্গলের সাজানো বাগানে চলে আসবে। আর দরিদ্রবান্ধব 'দলেই মহারাজ' হাঁ করে আকাশপানে চেয়ে থাকবেন– দলিত সংঘের মাতব্বর কৃষ্ণ পাড়িয়ারি উৎফুল-ও দাম্ভিক ভঙ্গিতে বলে চললেন।

শ্যামঘনবাবু শুনে গেলেন ও মনে মনে হাসলেন। গণপতি দলেই আকাশপানে চাইবে না, সে তাকাবে মাটির দিকে, রক্ত ঢালা চোখের জল ঢালা সেই সোঁদা নোনতা গন্ধ শুঁকতে থাকবে– ঠুঁটোর মত– একলা। তখন সে চাইবে আমাকে। চাক, আমি কী করব? আমার কিছু করবার নেই।

শ্যামঘনবাবু চুপ করে বসে রইলেন ও নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে তাঁর কিছু করবার নেই। ইশারা দেওয়া হয়ে গেছে, সুইচ টেপা হয়ে গেছে। আমার নয়, ব্যক্তির নয়, পারমাণবিক যুগের আদেশ। যথা সময়ে হাতে আসবে তলোয়ার ও মাথায় মুকুট, শ্যামঘন চৌধুরী যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়বে। আবার যথাক্রমে সনাতন মহান্তির বিনাশ হবে। তখন চক্রবর্তী বলতে শ্যামঘন চৌধুরী, আর কেউ না... আর কেউ না...

রায় বাহাদুর আলোচনার উপসংহার করে তার সারাংশ বললেন, ওয়েল, এখন কথা হচ্ছে যে সনাতন মহান্তির মন্ত্রিসভার অবস্থা সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি দলত্যাগ করবেন। দলত্যাগ করবেন শ্যামঘন চৌধুরীও। এই দুই নেতার অনুগত অন্তত দশ জন সদস্য এই দিকে আসবেন বলে আশা করা যায়। বাকি থাকলেন একজন– কোম্পানিওয়ালা শঙ্খু মহাপাত্র। তাঁকে একটা খনির মাইনিং লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি সাতজনকে সঙ্গে আনবেন।

দুই– প্রেসওয়ালা কহ্নেই বল। তাঁর শিরে সংক্রান্তি– কন্যার বিবাহ। মাত্র পাঁচ হাজার হলেই যথেষ্ট, তার ব্যবস্থা করবেন মহাপাত্র। তিনি আনবেন তিন জন।

তিন– জমিদার অর্জুন সামন্ত। তিনি মন্ত্রী হবেন, সঙ্গে আনবেন পাঁচ।

চার– শবর সাঁওতাল চাষীভাইদের নেতা স্বনামধন্য গণপতি দলেই বিদায়। ফলে অন্তত জন আষ্টেক এদিকে চলে আসবে।

পাঁচ– কুমুদিনী দেবী।

শ্যামঘনবাবুর আর শোনার ধৈর্য ছিল না। এত একদুইতিন না করলে কি চলত না? যা হল সে কথাটা চটপট বলে ফেল। পদ্মা অপেক্ষা করে আছে। ওকে আমি সকালে রাগিয়ে দিয়ে এসেছি। ফিরে গিয়ে হাসাব, আদর করব।

কিন্তু আসল কথা তখনো শেষ হয়নি– নতুন সরকার গড়া হলে তাতে কে কী হবে, কে কোন বিভাগের মন্ত্রী হবে। আবার শুরু হল রায় বাহাদুরের এক দুই তিন। হাঁ, ধন্য বটে! কেমন মোলায়েমভাবে উনি বিনয়মধুর হাঁনা ক রেই ফুলের মালাখানি গেঁথে ফেললেন, যেন প্রত্যেকের জন্য আগে থেকে একটি করে আসন ঠিক হয়েই ছিল– ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। সেই সাবলীল অনুক্রমের জের টেনেই তিনি উচ্চারণ করলেন– ছাত্রনেতা যুবনেতা শ্যামঘন চৌধুরী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি...

শ্যামঘনবাবু ঊর্ধ্বোত্তোলনের শিহরণ অনুভব করলেন। হঠাৎ তাঁর কেমন মনে হল যে এই তার চূড়ান্ত মুহূর্ত যাতে তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখে যাবেন। নির্ভয়ে বলবেন যা তিনি আজ বলতে চান, কারো তোয়াক্কা করবেন না।

সুতরাং তিনি বলে উঠলেন– না, আমায় গণপতি দলইয়ের কাজ দিন। আমার বিশ্বাস আমি পারব।... গনিআর কুরসিখানা বুঝি এখনো গরম রয়েছে, তারই গায়ের গরমে।

তাঁর চাউনিতে আবদারের যে অনির্বচনীয় মাধুরী প্রকাশ পেল তাতে তাঁর কথা কেউ ঠেলতে পারলেন না। শ্যামঘন চৌধুরী গণপতি দলেইয়ের গদিতেই বসবেন স্থির হল।

চার.

পদ্মাদেবী পথ চেয়ে বসে ছিলেন। শ্যামঘনবাবু হাসি হাসি মুখ করে

দেশের উন্নতি করতে হলে সাহস করে কিছু একটা করতেই হব। সনাতন মহান্তি থাকলে থাকুক, কী আর করা যাবে? সে আমাদের সঙ্গে একটাও কথা না বলে কেবল পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছিল। যাই হোক, আমি দল ছাড়লাম। একদম বিলকুল ছেড়ে দিলাম। ওরা সকলেই ছাড়ল। আমরা যে নতুন দল গড়লাম তার নাম হল সংযুক্ত সর্বমঙ্গল পার্টি। নরিপুরের রাস্তায় সেই যে ঝকঝকে তিন তলা বাড়িটা, মনে পড়ছে? সেইখানে মিটিং হচ্ছিল, সেটাই হচ্ছে এসএসপি অফিস। যাই হোক, আমি দল ছাড়লাম। অন্য অনেকেই ছাড়ল।

ফিরলেন। অবশ্য এই মৃদুমধুর হাসিটুকু তাঁর সযত্নে নির্মিত ও লালিত। পদ্মাদেবীর সামান্য শীতল অথবা তপ্ত চাউনিতে তার অবস্থা কি দাঁড়াত তা বলা যায় না, তবে শ্যামঘনবাবু দেখলেন যে পদ্মার অভিমানভরা মুখে রঙ লাগতে শুরু করেছে। মানিনী মানভঞ্জনের অপেক্ষায় রয়েছে। অতএব তিনি তাঁর স্মিতহাস্যকে প্রসারিত করলেন এবং পদ্মাদেবীর হাত ধরে বললেন– রাগ করেছ? আই অ্যাম সরি। আমার ভুল হয়েছে।

পদ্মাদেবী উলটে স্বামীর হাত ধরলেন। কিছু বললেন না কিন্তু তাঁর স্ফুরণোন্মুখ দু'টি ঠোঁট শ্যামঘনবাবুকে চঞ্চল করে তুলল। সুখবরটা আগে ভাগে বলে দিতে তাঁর তর সইছিল না। বললেন– শোন, আমি একটা পলিটিক্যাল মিটিংয়ে গিয়েছিলাম, সুসংবাদ আছে!

পদ্মাদেবী তাঁকে টেক্কা দিলেন! সূক্ষ্ম চতুর একটি মুচকি হাসি হেসে স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– আমি জানি।

– তুমি জান? কী জান? ...ক্ষণিকের বিমূঢ় ভাব।

– আমি জানি যে আমার স্বামী হচ্ছেন মান্যবর মন্ত্রী শ্রী শ্রী শ্রী–

আনন্দ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে শ্যামঘনবাবু পদ্মাদেবীকে জড়িয়ে ধরলেন। ধরে তাঁকে তুলে ঘোরাতে গেলেন, যেন তিনি দশ বছর আগেকার তরল তারুন্যে ফিরে গেছেন। তারপর তিনি তাঁকে সামনা সামনি ধরে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন:

– কি হল বলব? সনাতন মহান্তি একটা চাল চালল। তাড়া খাবার আগেই গিয়ে পার্টির– মানে ধরণী মহাপাত্রের সঙ্গে শলা করল। আমি আজ ধরণী মহাপাত্রর কাছে গিয়ে দেখি কত্তা সেখানে গিয়ে বসে আছেন। দলের আর সব ছোট ছোট চাঁইরা এসেছিল। আমি দেখলাম আর অন্য উপায় নেই। দেশের উন্নতি করতে হলে সাহস করে কিছু একটা করতেই হব। সনাতন মহান্তি থাকলে থাকুক, কী আর করা যাবে? সে আমাদের সঙ্গে একটাও কথা না বলে কেবল পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছিল। যাই হোক, আমি দল ছাড়লাম। একদম বিলকুল ছেড়ে দিলাম। ওরা সকলেই ছাড়ল। আমরা যে নতুন দল গড়লাম তার নাম হল সংযুক্ত সর্বমঙ্গল পার্টি। নরিপুরের রাস্তায় সেই যে ঝকঝকে তিন তলা বাড়িটা, মনে পড়ছে? সেইখানে মিটিং হচ্ছিল, সেটাই হচ্ছে এস-এসপি অফিস। যাই হোক, আমি দল ছাড়লাম। অন্য অনেকেই ছাড়ল। আরো অনেকে ছাড়বে বলেও বোঝা গেল। তার পরে আর কিছু কথা নেই, আমরা হলাম সংখ্যাগুরু। আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। ঠিক হল যে সনাতন মহান্তি মুখ্যমন্ত্রী হবে। –হোক, আর কত দিন? ধরণী মহাপাত্র গৃহমন্ত্রী হবে। আর আমি, আমি ঠিক করলাম যে আমি গণপতি দলেইয়ের জায়গায় বসব, মানে গ্রামমঙ্গল, আদিবাসী ও অনুন্নত...

কতক্ষণে তিনি আবিষ্কার করলেন যে পদ্মাদেবী নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁর চোখ জলে ভরে আসছে।

শ্যামঘনবাবু আহত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

শ্যামঘনবাবু নির্বোধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

বোকা মেয়ে কাঁদছে কেন? ও না সব জানে?

অনুবাদ **জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার**

লেখক পরিচিতি

১৯২৪ সালে ওড়িশার কটকে জন্মগ্রহণকারী গল্পকার, কবি এবং প্রাবন্ধিক কিশোরীচরণ দাস ওড়িয়া এবং ইংরেজি ভাষায় লেখালেখি করে থাকেন। তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছোটগল্পের দিকে। কর্মসূত্রে ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসে থাকার সুবাদে তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন ও বিদেশভ্রমণ করেছেন– থেকেছেন কলকাতা, দিলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়াজিল্যান্ডে। এর ফলে তাঁর গল্পে ঘটনা ও চরিত্ররা উঠে এসেছে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিকসামাজিক পরিম গুল থেকে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও মূল্যবোধ, আশা-হতাশা সবই রয়েছে ছোটগল্পে। এখন পর্যন্ত ওড়িয়ায় কিশোরীচরণের ১৩টি ছোটগল্পের সংকলন, একটি প্রবন্ধগ্রন্থ ও একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিশোরীচরণ সাহিত্য অকাদেমি (১৯৭৬) ও বিষুব পুরস্কার (১৯৯২) পেয়েছেন।

বাংলাদেশভারত মৈত্রী সমিতি
হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

BANGLADESH-BHARAT SAMPRITEE PARISHAD
বাংলাদেশভারত স ম্প্রীতি পরিষদ
নাহার পস্নাজা, ৯ম তলা, ২৬ সোনারগাঁও রোড
ঢাকা১০০০, বাংলা দেশ
ফোন: ০১৬৭৬ ০৪৮৫৭২
ই-মেইল
bangladesh-bharat-sampriti@yahoo.com
ওয়েবসাইট: http://www.shampritee.org

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India
ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

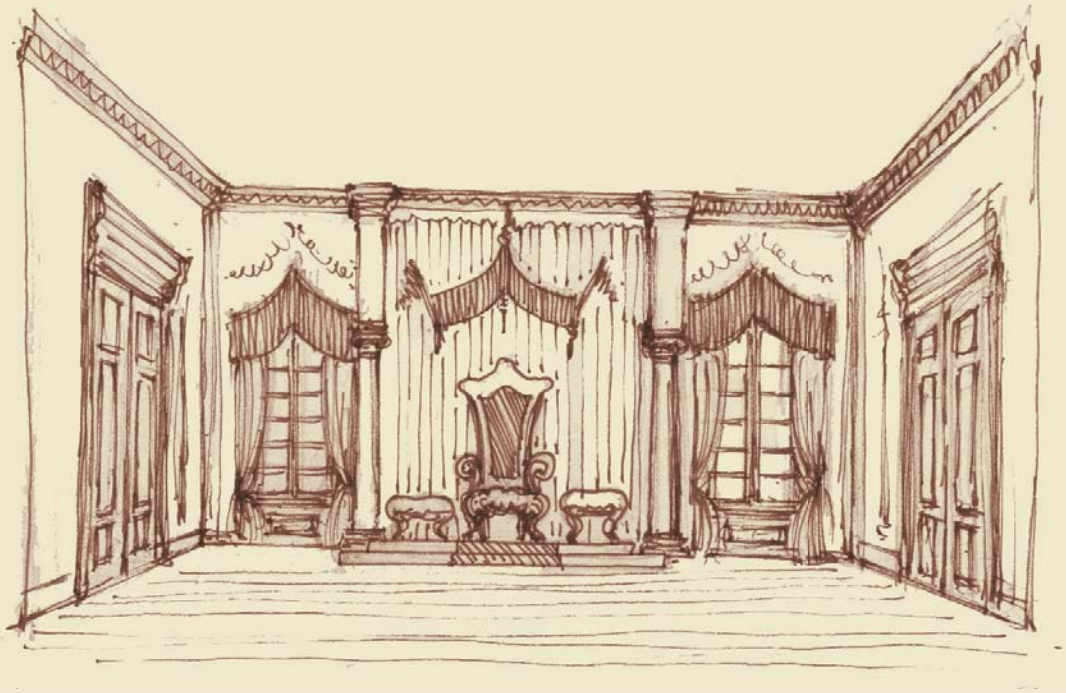

শিশুতীর্থ

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন **ড. দুলাল ভৌমিক**

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু-কিশোরযুবাবৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজসরল ভাষায় এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উলেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই *রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প* নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। এ-কাজে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরু হল রম্ভা-উর্বশীর নৃত্য-গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্য-খচিত একটি বহুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কি-না তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপ-িত বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কি-না।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্য-বীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে *দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা*। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো *রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প* নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

ভোজরাজ কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে দ্বিতীয় পুতুলের মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে উঠতে গেলেন। তখন দ্বিতীয় পুতুলটি বলে উঠল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত সহনশীল ও পরোপকারী হন, তাহলে এই সিংহাসনে বসার যোগ্য হবেন। ভোজরাজ বললেন: রাজা বিক্রমাদিত্য কিরূপ সহনশীল ও পরোপকারী ছিলেন?

প্রথম পুতুলের গল্প

মহারাজ ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করতে গিয়ে যেই প্রথম পুতুলের মাথায় পা দিলেন, অমনি পুতুলটি বলে উঠল: হে রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত শৌর্য বীর্য ঔদার্য ও ধৈর্যশীল হন, তবেই এই সিংহাসনে বসার অধিকারী হতে পারেন।

একথা শুনে ভোজরাজ বললেন: শোন পুত্তলিকা, আমি শৌর্যে বীর্যে ঔদার্যে বিনয়ে আর ধৈর্যে কারো থেকেই কম নই।

পুত্তলিকা বলল: কিন্তু রাজন্! আপনি তো নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। শাস্ত্রে আছে– সজ্জন কখনো নিজের গুণের কথা এবং অন্যের দোষের কথা প্রকাশ করেন না। তাছাড়া আয়ু, মন্ত্র, ধন, গৃহছিদ্র, অপমান, ওষুধ ও দান কর্মাদির কথা সর্বদা গোপন রাখতে হয়। রাজন্! এ সিংহাসনটি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের। তিনি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন। কাতর ব্যক্তি এবং সজ্জনকে তিনি তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রাও দান করতেন। আপনি যদি তাঁর মত দানশীল হয়ে থাকেন তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

পুত্তলিকার কথা শুনে ভোজরাজ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় পুতুলের গল্প

ভোজরাজ কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে দ্বিতীয় পুতুলের মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে উঠতে গেলেন। তখন দ্বিতীয় পুতুলটি বলে উঠল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত সহনশীল ও পরোপকারী হন, তাহলে এই সিংহাসনে বসার যোগ্য হবেন।

ভোজরাজ বললেন: রাজা বিক্রমাদিত্য কিরূপ সহনশীল ও পরোপকারী ছিলেন?

পুত্তলিকা বলল: শুনুন। একদিন মহারাজ সকল অনুচরকে ডেকে বললেন– পৃথিবীতে যত তীর্থস্থান আছে ঘুরে এস। যেটা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি সেখানে ভ্রমণে যাব।

একথা শুনে অনুচররা সকল তীর্থস্থান ঘুরে এল। একজন বলল: মহারাজ! চিত্রকূট পর্বতে একটি দেবালয় আছে। ঐ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে একটি ঝর্নাধারা নিচে পতিত হচ্ছে। দেখতে অপরূপ! ঐ ঝর্নার জলে স্নান করলে সকল পাপ দূর হয়। তার পাশে এক কুণ্ডে এক ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যায় রত আছেন। অনবরত হোম করছেন। কতকাল ধরে তা কেউ বলতে পারে না। কেউ তাঁর সঙ্গে কথাও বলে না।

চরের কথা শুনে মহারাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে চিত্রকূটে গেলেন। তার মনোরম দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তারপর ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কতকাল ধরে তিনি তপস্যা করছেন। উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন: শতবছর ধরে। কিন্তু এখনো দেবতার সাক্ষাৎ পাইনি।

ব্রাহ্মণের কথায় রাজার দয়া হল। তিনিও তপস্যা করতে লাগলেন। হোমাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। কিন্তু সবই বৃথা। তখন মহারাজ তরবারি দিয়ে নিজের মস্তক ছিন্ন করে আহুতি দিতে উদ্যত হলেন। এমন সময় দেবী আবির্ভূত হয়ে মহারাজের হস্ত ধারণ করে বললেন: বৎস! আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।

মহারাজ শ্রদ্ধাভরে বললেন: দেবী! আমি নিজের জন্য তপস্যা করিনি। আমি তপস্যা করেছি এই ব্রাহ্মণের জন্য। ইনি শতবছর ধরে তপস্যা করছেন। কিন্তু আপনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হচ্ছেন না কেন?

দেবী বললেন: এ শতবছর ধরে তপস্যা করছে ঠিকই, কিন্তু এর তপস্যায় একাগ্রতা ও নিষ্ঠার অভাব আছে। একাগ্রতা ও নিষ্ঠার অভাব থাকলে কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কথায় বলে– দেবতা, মন্ত্র, তীর্থ, দৈবজ্ঞ, ওষুধ, গুরু আর ব্রাহ্মণে যার যেমন ভক্তি, তার তেমন সিদ্ধিলাভ হয়। কোন মূর্তিতে দেব-দেবী অধিষ্ঠান করে না, ভক্তির মধ্যেই ইষ্ট দেব-দেবীর অধিষ্ঠান। তাই সিদ্ধিলাভের মূল কারণ ভক্তি।

মহারাজ তখন করজোড়ে বললেন: দেবী যথার্থই বলেছেন। এখন আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে এই ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ করুন– এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজের কথায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন: তাই হবে। তুমি পরোপকারী বলেই নিজের দেহকে পীড়ন করে অপরের শ্রম লাঘব করছ। বৃক্ষ যেমন রৌদ্রতাপ সহ্য করে পথিককে শীতল ছায়া দান করে, অপরকে জল দানের জন্য নদী যেমন জল বহন করে– তেমনি পরোপকার করার জন্যই সজ্জনেরা দেহ ধারণ করেন।

এভাবে দেবী মহারাজের প্রশংসা করে ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ করলেন।

কাহিনিশেষে পুত্তলিকাটি রাজা ভোজকে বলল: রাজন্! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় এমন পরোপকারী হন, তাহলে এই সিংহাসনে বসার অধিকারী হবেন।

পুত্তলিকার কথা শুনে ভোজরাজ অবনত মস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরবর্তী সংখ্যায়

পুত্তলিকা বলল: কিন্তু রাজন্! আপনি তো নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। শাস্ত্রে আছে– সজ্জন কখনো নিজের গুণের কথা এবং অন্যের দোষের কথা প্রকাশ করেন না। তাছাড়া আয়ু, মন্ত্র, ধন, গৃহছিদ্র, অপমান, ওষুধ ও দান কর্মাদির কথা সর্বদা গোপন রাখতে হয়। রাজন্! এ সিংহাসনটি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের। তিনি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন। কাতর ব্যক্তি এবং সজ্জনকে তিনি তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রাও দান করতেন। আপনি যদি তাঁর মত দানশীল হয়ে থাকেন তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

ড. দুলাল ভৌমিক
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

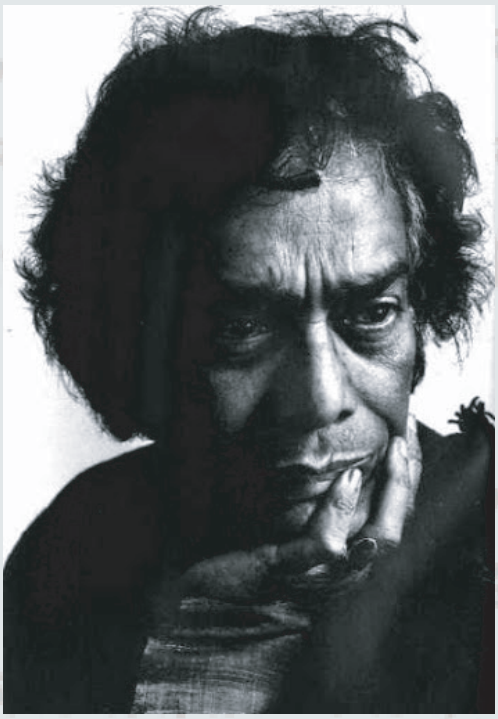

প্রবন্ধ

গঙ্গা
জীবনেরই প্রতিচ্ছবি

আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

সমরেশ বসু র (১৯২৪–১৯৮৮ খ্রি.) জন্ম ঢাকা জেলার রাজানগর গ্রামে। *আদাব* গল্পটি (১৯৪৬ খ্রি.) শারদীয়া *পরিচয়* (প্রথম মুদ্রিত রচনা)-এ প্রকাশের পরপরই সাহিত্যমহলে তিনি ব্যাপক সাড়া জাগান। পরবর্তীসময়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন প্রবাদপুরুষ হিসেবে স্থান করে নেন। নব্বইটি উপন্যাস, পনেরোটি গল্প সংকলন এবং কালকূট ছদ্মনামেও অনেক গল্প আছে তাঁর। ছোটদের জন্য গোয়েন্দাকাহিনি-উপন্যাস-গল্প ছাড়াও গল্প ও উপন্যাসের চিত্রনাট্যও তৈরি করেছেন তিনি। উলেস্নখযোগ্য উপন্যাস *গঙ্গা* (১৯৫৭ খ্রি.)-য় তাঁর প্রতিভা ফুটে ওঠে আপাদমস্তক।

গঙ্গা নদীঘনিষ্ঠ একটি মহাকাব্য, নদীভিত্তিক ও নদীকেন্দ্রিক এবং নদীদ্বারা আবৃত জীবনকাহিনির সঙ্গে উপন্যাসটির সর্বাঙ্গে মিল লক্ষ্য করা যায়। কখনো ঝড়-ঝঞ্ঝা, কখনো মহামারী আবার কখনো যুদ্ধ-সংগ্রাম, নিজেদের মধ্যে কাজিয়া এবং হানাহানিই হল মানবজীবনের প্রকৃত রূপ। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করে বেঁচে থাকার নামই জীবন। *গঙ্গা* সেই লড়াই করে বেঁচে থাকারই কথামালা।

মাছমারারা কতখানি হতদরিদ্র, তা স্পষ্টভাবেই চিত্রায়িত হয়েছে, তারপর তাদের মাথার ওপর আছে মহাজন– আছে ফড়ে, দাদন ব্যাপারী– কেউই ছাড় দেয় না, সুদখোর মহাজনগুলো মাথার ওপর চোখ ফেলে বসে আছে, অল্প দামে মাছ কিনে নেবে, অথবা সুদ হিসেবে মাছ ছিনিয়ে নেবে, এটাই প্রকৃতি এবং তাদের বিধান। যে কারণে মাসের পর মাস ঝড়-বৃষ্টি

নদী এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে নগরসভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য। পদ্মানদীর মাঝি, গঙ্গা, তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে যে মানুষেরা এসেছে, তারা তো নদী অন্বিত। নদী ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব নেই, নদী তাদের বাঁচামরা, নদীই তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা, লড়াই-জয়-পরাজয়ের অনিবার্য পটভূমি। বাংলাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপন্যাসেই জেলে-মালোজীবনের নিরাপত্তা-স্থিতিশীলতার স্বপ্ন কৃষিবিশ্ব।

বিপদ মাথায় নিয়ে মাছ মারলেও জীবনের উন্নতি আসে না, সবই মহাজন এবং ফড়ের ঘরে চলে যায়, জীবনটা চলে ধুঁকেধুঁ কে, মালোপাড়ার মানুষের জীবনগুলো যেন বিধাতা এভাবেই গড়ে তুলেছেন, যার কারণে রোগ-শোক চিরসঙ্গী। *গঙ্গার* মূলচেতনা নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ। মানুষপ্রকৃতিপরি বেশনদী এ উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। সমরেশ বসু বিশেষ একটি অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি অংকিত করেছেন। নদীই হল উপন্যাসের সক্রিয় এবং আচরণশীল চরিত্র। এই নদীই কোন কোন সাহিত্যে প্রধান এবং নিয়ামক, কোন কোন সাহিত্যে উজ্জ্বল পটভূমি, সমগ্র মানুষের জীবনটাই নদী দ্বারা প্রভাবিত। যেন এই নদীই শাসন করে চলছে জীবপ্রকৃতি এবং জগতকে, আদিকাল থেকে যেমন দেখা যায় নদীতীরবর্তী জনপদই গঞ্জ বা নগর, তেমনি এই গঞ্জ বা নগরই জীবন জীবিকার অবলম্বন। নদী এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে নগরসভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য। *পদ্মানদীর মাঝি, গঙ্গা, তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে যে মানুষেরা এসেছে, তারা তো নদী অন্বিত। নদী ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব নেই, নদী তাদের বাঁচামরা, নদীই তাদের সাফল্যব্যর্থতা, লড়াইজয়পরাজয়ের অনিবার্য পটভূমি। বাংলাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপন্যাসেই জেলেমা লোজীবনের নিরাপত্তাস্থিতিশীলতার স্বপ্ন কৃষিবিশ্ব। চাষীর জীবন উঁকি মেরেছে মেঘের বুকের সূর্যের মত। কিন্তু তারপরও জীবন বাঁধা, ওই নদীর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে, যেনবা এই জীবন নদীর বাইরে যেতে পারে না।

গঙ্গার সকল চরিত্র জেলেদের জীবনদিনলিপি, যা দারিদ্র্যে ভরপুর, জীবন সংসার ছেলে-মেয়ে বউঝি মা-বাবাকে কোনরকমে আধাপেটা খেয়েপড়ে বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম। জীবনযন্ত্রণার মধ্যেই জীবনের পটভূমি রচিত হয় বারংবার। বর্ষার মরশুম চার মাস, আষাঢ়শ্রাবণ ভাদ্রআশিন, মাছমারারা তখন অমাবস্যাপূর্ণিমার জোয়ার-ভাটার গোন কোটালের পিছেপি ছে ভেসে বেড়ায় গাঙে-নদীতে, কিন্তু মাছমারার বউঝিরা জেগে থাকে তামাম রাত্রি, তখন সমগ্র বিশ্বসংসার ঘুমে আচ্ছন্ন, প্রকৃতি ধ্যানে নিমগ্ন, শুধু মাত্র জাগে মাছমারার বউ ছেলে-মেয়ে বাবা-মায়েরা, ঘুম কি আসে কখনো, ঘুম যে তখন পালিয়ে গেছে, কারণ ঘরে যে পুরুষ নেই, বাপ নেই ছেলে নেই। ঘুমঘুম চোখ ঢুলুঢুলু হলেও বুক বড় ছ্যাঁকছ্যাঁক করে ওঠে। কখন কার কি হয়, কে কি ভাবে আছে। মাঠাকুর ণকে স্মরণ করে, খোকাঠাকুরকে প্রার্থনা জানায়, ঘরের লোক যেন ভাল থাকে, পুজো দেয় মাগঙ্গাকে, সবই করে লৌকিক-অলৌকিকতার বিশ্বাসে। ঘরের মানুষের জন্য আর কার কাছেই বা ফরিয়াদ করবে?

গঙ্গা উপন্যাসের নায়ক বিলাস, নতুন ধরনের চরিত্রকল্পনা অবশ্যই, যে সমস্ত অন্যায় আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠস্বর একজন। খুড়ো পাঁচু তাকে যতই আগলে রাখুক না কেন আসলে সে প্রতিবাদ করতে ছাড়ে না, যেন সে বংশ পরম্পরা প্রতিবাদ করতেই শিখেছে, রক্তকণিকার মধ্যে ওর বিদ্রোহ দাউদাউ ক রে, কারণ ওর বাবা সাঁইদা নিবারণ, যে কিনা বাঘের পেটে গেছে। তারাশঙ্করের *হাঁসুলি বাঁকের উপকথার* করালীতে হয়তো বিলাসের আদল আছে কিন্তু সন্দেহ নেই বিলাসের পটবিধৃত মৌলিকতায়।

কলকাতার কাছের শহর নৈহাটিতে স্থায়ীভাবে বাড়ি করে যখন সমরেশের বসবাস, সে সময় বঙ্কিম জন্মবার্ষিকীতে এসেছিলেন তারাশঙ্কর, ব্যক্তিগত আলোচনায় তারাশঙ্কর *গঙ্গা* উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মুক্ত সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। সমরেশ তাঁকে বলেছিলেন *গঙ্গা* তাঁর কাছে প্রাণের প্রতীক, প্রেমের প্রেরণা। তবে এ কথা সত্য যে, *গঙ্গাই* ছিল সমরেশ বসুর জীবন, যে *গঙ্গা* তাঁর চেতনার আর উপলব্ধির পাড় ভেঙেছে বারবার, এই গঙ্গা আক্ষরিক অর্থে নদী নয়, জীবন–মহাজীবন, শুধু জীবনই বা বলি কেন 'সময়', নদী চলেছে সমুদ্রে, সময়ও– অতীত থেকে ভবিষ্যতের অকুল দরিয়ায়। আজকালপর শুর বাঁক ছাড়িয়ে চিরকালের বা মহাকালের দিকে, মহাকাল সে তো সুদূরদিগন্তে, অসীমের মাঝে হারিয়ে নিজেকে খুঁজে ফেরা, এই জীবন চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে মৃত্যুচেতনা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'অনেক ভাগ্যগুণে মানবজন্ম পেয়েছিস, পৃথিবীতে এসেছিস, কিছু একটা দাগ রেখে যা'... স্বামীজীর এই নির্দেশ সবাই তো অনুসরণ করতে পারে না, তবে কেউ কেউ পারে, সমরেশ বসু পেরেছিলেন, তার দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আঙিনায় তিনি এমন এক গভীর দাগ রেখে গেলেন, যা কোনভাবেই মুছে যাবার নয়।

অমৃত কুম্ভের সন্ধানে সাফল্যের তুঙ্গে পৌঁছলেও সমরেশ তাঁর রচনায় বিষয় ও ক্ষেত্র বা আঙ্গিক পরিবর্তন করেন, ফিরে এলেন সমতলের গঙ্গায়। ধীবর বা মালোদের জীবনের বিচিত্র কাহিনিতে, নদী থেকে সমুদ্রে যার বিস্তার, এই পৃথিবীর আদিম এক শিকারী সমাজ যাদের জীবনের সিকি ভাগ ডাঙায় আর বাকি তিন সিকি ভাগই পড়ে থাকে জলে, মাছেদের সঙ্গে, নদী এসেছে তার জীবনে সর্বনাশা কুলত্যাগিনী নারীর অনিবার্য রূপকে, জলের ঋতু বদলায়, প্রহরেপ্রহরে রঙ বদল হয়, তার অদৃশ্য অজানা গর্ভে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেখা দেয় জলের শস্য, জীবনের ফসল। সেখানে ঝরাখরা ও মরার ত্রিমিতি, মিঠে জলে মেশে জীবনের লবণ। এই মানুষগুলির দিবারাত্রির বারোমাস্যায়

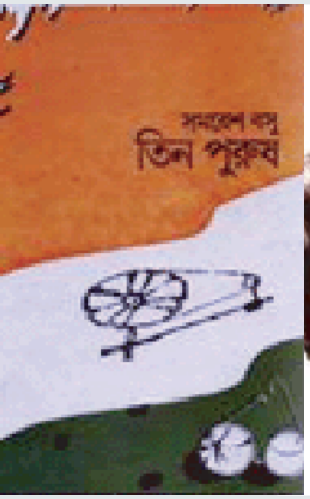

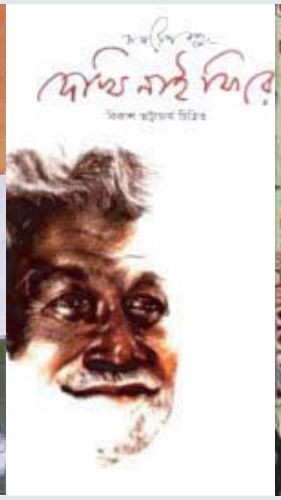

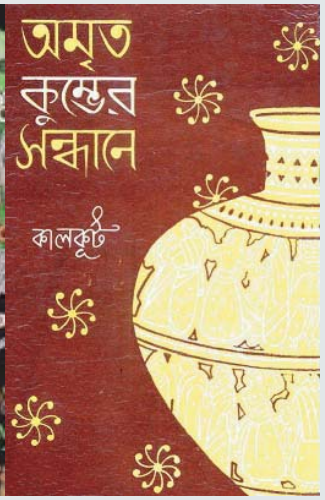

ছায়া ফেলে অসংখ্য জীবাশ্মঘটিত জটিল সংস্কার অধর কিংবদন্তীর গল্পমালা। জীবিকা হয়ে ওঠে জীবনের নেশা। নিয়তির মত নিষ্ঠুর উদাসীন প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব পুরুষানুক্রমে নাটকীয় রূপ নিয়েছে মাছমারাদের জীবনে।

এই মাছমারাদের হালেজা লে হাত রেখে তিনি তাদের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করেছেন, যেন মুখোমুখি বসে একই বিড়ির আগুনে গল্প ধরিয়েছেন, এই অন্তরঙ্গতাই যুগিয়েছে *গঙ্গা* উপন্যাসের উপকরণ। তার চালচরি ত্র এবং চালচিত্র। গাবে মজানো জালের মতই গল্পের রসে আঁচিয়ে এর ক্যানভাসটা ছড়িয়ে পেতেছিলেন সমরেশ, প্রবল জলস্রোতের সঙ্গে পালা দিয়ে চলেছিল এর ভাটিয়াল কাহিনি, বর্ণবহুল ঘটনায় ছলাৎ ছলাৎ দাঁড়টানার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল থেকে-থেকে, সে সঙ্গে আরো একটা বাড়তি পাওনা, সব ছাড়িয়ে আবেগ, অন্যরকম জলের টানের মতই ভাষায়। তবে *গঙ্গা* উপন্যাসটি শহরঘেঁষা বলা যেতে পারে, চরিত্রের অনুষঙ্গে, কাহিনির দাবিতে *গঙ্গায়* বসিরহাট-ত্রবেণী-নৈহাটি- হুগলীক ্যানিংহাসনাবাদ এবং চ ন্দননগরের মত বেশ কিছু অঞ্চলের কথা উলেখিত হয়েছে, এসব অঞ্চলের বাতাবরণ শহরঘেঁষা। তবে উপন্যাসের ভূমিকায়, সমরেশ বসু লিখেছেন, আতপুর ও হালিশহরের মৎস্যজীবীদের সহযোগিতা না পেলে *গঙ্গা* লেখা সম্ভব হত না। উপন্যাসটি লেখার আগে অনেক মালো পরিবারের সঙ্গে দিনরাত্রি গঙ্গাবক্ষে কাটিয়েছেন তিনি।

গঙ্গা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঠককে সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারেনি, *গঙ্গা* শুধুমাত্র গঙ্গাতেই থেকে গেছে, উপন্যাসের তাবৎ জায়গা জুড়ে পাঁচু খুড়ো এবং তার সাঁইদা নিবারণের ছেলে বিলাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাদের কথোপকথন এবং গঙ্গার দৃশ্যবলী ছিল প্রধান আর্কষণ। তারপর একদিন আমাশয় আক্রান্ত হয়ে পাঁচু মারা যায় উপন্যাসের শেষদিকে, এরমধ্যে হিমিবিলা সের প্রেম উপাখ্যানটিও চমৎকার, দামিনীর নাতনির অমন শরীর-স্বাস্থ্য এবং প্রেমকাতর অনুভূতি কাকে না টেনে পারে, যতই হোক সে ফড়েনি, রক্তমাংসের মানুষ তো, ভাল না বেসে পারে কি ভাবে? এভাবেই হয়তো সাধারণ পাঠক চিন্তা করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বিলাস সত্যিকার ভালবাসাই দিতে চেয়েছিল, এখানে তার কোন ফাঁকি ছিল না। বিলাস জানে হিমি প্রতারক-প্রেমিক পরিত্যক্ত, ওর মা রাঁড়ি, তারপরও ভালবাসে, নিখাদ প্রেমিক হতে চেয়েছিল, কিন্তু সে ভালবাসা যে অন্তরের ভালবাসা, তাও পাঠক দেখতে পায়, যখন বাগবাজারের খালের মোড়ে হিমি মাথা নীচু করেই বলল, এসব রইল, ট্যাকাপয়সা সোনাগয়না, তুমি রা খো।

– আর তুমি?

নীলাম্বুধি বিশাল বিলাসের পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল হিমি, ওগো ঢপ, আমি যেতে পারবো না তোমার সঙ্গে। সমুদ্রে যেন আবৃত হয়ে উঠল।

–কেন গো মহারানি?

পায়ে মাথা ঠুকে বলল হিমি, সাহস পাইনে ঢপ। আমি এতটুকু প্রাণী, তোমার অকুলে আমি বেড় পাবো না। এই আমার বড় মনচনমনানি ছিল। তুমি যা বে অকুল সমুদ্রে, আঁধার রাত্রে আমার প্রাণ পুড়বে, তোমার নাগাল তো আমি পাবো না।

বিলাস শান্তভাবেই বলল, আমি মাছমারা মহারানি, অকুলে আমার জীবন, অকুলে আমার মরণ।

হিমির চুল খুলে গেল, কাজল ধুয়ে গেল চোখের জলে। রুদ্ধ কান্নায় বলল, পারব না পারব না গো। আমি এতটুকু, এত বড়কে পাওয়ার ভাগ্যি আমি করিনি।

বড় প্রেম সবসময় কাছেই টানে না, অনেক সময় দূরেও সরিয়ে দেয়। *গঙ্গার* বিলাসহিমির প্রেমের চিত্রটি একইভাবে অংকিত হয়েছে। বিলাস ফিরে গেছে ধলতিতার দিকে, তারপর সে সাঁইদার হয়ে কয়েক গণ্ডা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যাবে, সমুদ্রের গর্জন সে শুনতে পেয়েছে, তাকে কে আর আটকে রাখে? আর হিমি ফিরেছে তার নিজের ডেরায়, যেখানে তার দিদিমা দামিনী আছে, আছে তার চেনাজানা মানুষগুলো। বাস্তব যে কত কঠিন সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে আবেগকে কোনভাবে প্রশ্রয় দেয়নি, সংসারের কত নিয়মই না মানুষ মেনে চলে। প্রেম যে কি সুন্দর তা হয়তো এভাবেই কখনোসখ নো লোকচক্ষুর সামনে ধরা দেয়। তখনই মনে হয় প্রেম প্রকৃত অর্থেই স্বর্গ থেকে আসে আবার স্বর্গেই চলে যায়। প্রেমের কত রূপ, কত রঙ কত আঙ্গিক তা আমরা বাস্তবে দেখি *গঙ্গায়*, বিলাসহি মির প্রেমের দৃশ্যে।

গঙ্গা উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় সীমাবদ্ধ থেকেছে, সমুদ্রে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এবং একত্রিশ হাত লম্বা সেগুন কাঠের বাছাড়ি নৌকা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরার যে স্বপ্ন তা শুধুমাত্র স্বপ্নেই রয়ে গেছে বিলাসের। বাস্তবে না দেখা গেলেও আসলে আবেগকে ছুঁয়ে যাওয়ার যে প্রয়াস তা পাঠক ভালভাবেই অনুধাবন করেছে, এখানেই হয়তো *গঙ্গার* সার্থকতা। পাপেপু ণ্যে হেজেম জে গাঁজিয়ে ওঠা জীবনকে এমন সাষ্টাঙ্গে সাপটে ধরতে হলে কেবল জীবনশিল্পী হলেই চলে না, হয়ে উঠতে হয় জীবনশিকারী। সমরেশ যেন ছিলেন তাই, গহন গাঙের মহাকর্ষে ভাসা অবিশ্বাস্য শিকারীর মতই সমরেশের আঙুলেও যেন জড়ানো ছিল সেই জালের খুঁটনি, সেই বার্তাবাহী সূক্ষ্ম সুতো। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'নৈহাটিতে থাকাকালীন সময়, তারাশঙ্করের *কবি* উপন্যাসের নিতাইয়ের একটা গান নিজের সুরে মাঝেমা ঝে গাইত– 'জীবন এতো ছোট ক্যানে/ ভালোবেসে মিটিলো না সাধ এ

গঙ্গা উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় সীমাবদ্ধ থেকেছে, সমুদ্রে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এবং একত্রিশ হাত লম্বা সেগুন কাঠের বাছাড়ি নৌকা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরার যে স্বপ্ন তা শুধুমাত্র স্বপ্নেই রয়ে গেছে বিলাসের।... পাপে-পুণ্যে হেজে-মজে গাঁজিয়ে ওঠা জীবনকে এমন সাষ্টাঙ্গে সাপটে ধরতে হলে কেবল জীবনশিল্পী হলেই চলে না, হয়ে উঠতে হয় জীবনশিকারী। সমরেশ যেন ছিলেন তাই, গহন গাঙের মহাকর্ষে ভাসা অবিশ্বাস্য শিকারীর মতই সমরেশের আঙুলেও যেন জড়ানো ছিল সেই জালের খুঁটনি, সেই বার্তাবাহী সূক্ষ্ম সুতো।

পিরোজশা গোদরেজ– গোদরেজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আর্দেশির গোদরেজের ছোটভই

শিল্পোদ্যোগ

গোদরেজ গ্রুপ

শিল্পোদ্যোগের তালা খোলা

১০৭ বছরের পুরনো ব্যবসায় গ্রুপ গোদরেজ তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের মালিকদের হাত ধরে আজ তালা ও সেফস্ থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও প্রপার্টি বিক্রিতে এসে পৌঁছেছে। তাদের আগ্রহের তালিকায় এখন রয়েছে অনেককিছুই, তবে সাফল্যের চাবিকাঠি তালা থেকেই।

প্রাথমিক ব্যবসায় উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর পারসি আইনজীবী আর্দেশির গোদরেজ ১৮৯৭ সালে তালা তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। উচ্চ নিরাপত্তার এ্যাংকর তালা জনপ্রিয় হওয়ায় গোদরেজের ব্যবসায়িক ভিত্তি দাঁড়িয়ে গেল। গোদরেজ তালা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে স্টিলের আলমারি গোদরেজ তালা ছাড়া চলেই না। গোদরেজের আকার-আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপটি এমন সব পণ্য উৎপাদনে মনোযোগী হয় যা বাজারে একেবারে আনকোরা।

চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় ১৯২১ সালে গোদরেজ প্রথম ভারতীয় সেফ তৈরি করে। এরপর আর্দেশির ছোটভাই পিরোজশা গোদরেজের সঙ্গে সাবান ও ভোজ্যতেল উৎপাদন শুরু করেন। দুইভাই ১৯১৮ সালে গোদরেজ সোপস্ লি. প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছরে তাঁরা পশু চর্বি ব্যবহার না করে বিশ্বের প্রথম সাবান তৈরি করেন, পরে যার নামকরণ করা হয় সিন্থল। ১৯২৩ সালে গোদরেজ তার প্রথম আলমারি তৈরি করে।

দেশ স্বাধীনের পর ব্যবসায়ে জোয়ার এল। ১৯৫১ সালে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনের জন্য গোদরেজকে ব্যালট বাক্স তৈরির কার্যাদেশ দেয়। আস্থার সূচনা সেই থেকেই।

গোদরেজ পরিবার মুম্বইয়ের প্রধান রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ের মালিক। মুম্বইয়ের উপকণ্ঠে পিরোজশা গ্রুপের সদর দফতরে একটি শিল্পবাগানের ভিত্তি স্থাপন করেন। এখন এই শিল্পবাগান উপশহরের নামকরণ করা হয়েছে পিরোজশানগর। আর্দেশির ও পিরোজশার পর পিরোজশার তিন ছেলে বুরজর, সোহরাব ও নাবাল গোদরেজ গ্রুপের হাল ধরেন।

তৃতীয় প্রজন্ম থেকে ব্যবসায় সাম্রাজ্যে ধ্বংস নেমে আসে, এমন জনপ্রিয় ধারণা মিথ্যা করে দিয়েই কিন্তু গোদরেজ পরিবারের সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ সম্ভব হয় তৃতীয় প্রজন্মের হাত ধরেই। তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন আদি গোদরেজ, যিনি গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর কর্ণধার, আছেন তাঁর ভাই নাদির গোদরেজ, যিনি গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও গোদরেজ এগ্রোভেট লি.-এর চেয়ারম্যান, আছেন

চাচাতভাই জামশিদ গোদরেজ, যিনি গোদরেজ এন্ড বয়েস ম্যানুফাক্চারিং কোম্পানি লি.-এর দেখভাল করেন। এটিই গোদরেজ পরিবারের টেকসই হোল্ডিং কোম্পানি।

বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে শিক্ষাগ্রহণ শেষে ১৯৬৩ সালে বুরজর গোদরেজের ছেলে আদি গোদরেজ যখন ব্যবসায়ে যোগ দেন, গোদরেজ গ্রুপের তখন দু'টি প্রধান ব্যবসায়িক ধারা– এক. গোদরেজ এন্ড বয়েস লি. যেটি তালা, সেফস্, রেফ্রিজারেটর, স্টিলের আলমারি তৈরি করে; দুই. গোদরেজ সোপস্ লি.। আদি গোদরেজ গ্রুপকে ফর্কলিফ্ট ট্রাক ও পশুখাদ্যর মত নতুন ব্যবসায়ে নিয়ে এলেন।

বিশ্ব অভিযাত্রা

অন্যান্য অনেক শিল্পগ্রুপের মত গোদরেজ গ্রুপও তাদের বিশ্বমুখী অভিযাত্রা শুরু করে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই। নাদির ও জামশিদকে সঙ্গে নিয়ে আদি গোদরেজ বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে হাত মেলান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে যৌথ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলেন।

গোদরেজ গ্রুপ ১৯৯৪ সালে ট্রান্সইলেকট্রা ডোমেস্টিক প্রোডাক্টস্ কিনে নেয়। গুড নাইট ব্র্যান্ডের মশার ম্যাট উৎপাদনে এটি ছিল তখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। গোদরেজ গ্রুপ পরে ব্যানিশ, জেট, হেক্সিট ও ইজি-র মত জনপ্রিয় ব্যান্ড কিনে নেয়। ২০০১ সালে গোদরেজ গ্রুপ হিন্দুস্থান লিভার লি.-এর কাছ থেকে পশুখাদ্য ব্যবসায় কিনে নেয়– পরে যার নামকরণ করা হয়েছে হিন্দুস্থান ইউনিলিভার লি.।

২০০৫ সালে গোদরেজ গ্রুপের প্রথম আন্তর্জাতিক অর্জন– যুক্তরাজ্যের কিলাইন ব্রান্ডস্ লি. ক্রয়। তারপর জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মত জায়গায় কুটিকুরা, এরাসমিক ও নিউলোন-এর মত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্রান্ড ও ট্রেডমার্ক কিনে নেয়।

২০১০ সালে গোদরেজ এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা– তিন মহাদেশে পারসোনাল ওয়াশ, হেয়ার কেয়ার ও ইনসেক্টিসাইড– তিন বিভাগের ওপর জোর দিতে ৩x৩ রণকৌশল গ্রহণ করে।

তারপর অনেক আন্তর্জাতিক অর্জন হয়েছে। সর্বশেষ হচ্ছে ২০১২ সালে চিলির কসমেটিকা ন্যাচিওনাল এবং যুক্তরাজ্যের কোলগেট-পামোলিভ কোম্পানির মেয়েদের ঘামের গন্ধনাশক সফট্ এন্ড জেন্টল ক্রয়।

গোদরেজ গ্রুপ জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি, প্রোকটর এ্যান্ড গ্যাম্বেল কোম্পানি, সারা লি কর্পোরেশন, পিলস্বারি কোম্পানি এলআইসি এবং হারশে কোম্পানির সঙ্গে যৌথ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলছে। যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক কোম্পানি টাইসন ফুডস্ ইনকর্পোরেটেড ছাড়া বাকি সবার সঙ্গে যৌথ শিল্পোদ্যোগ শেষ হয়েছে।

গোদরেজ গ্রুপের ৯ তথ্যচুম্বক

- গোদরেজ প্রথম ভারতীয় কোম্পানি যে ১৯৫৮ সালে রেফ্রিজারেটর উৎপাদন করে।
- ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনের জন্য ব্যালট বাক্স তৈরির জন্যে বলা হয়।
- গোদরেজ ইজি হচ্ছে প্রথম তরল ডিটারজেন্ট ব্রান্ড যার বিজ্ঞাপন ভারতীয় টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে।
- গ্রুপের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ভারতীয় মহাসড়কে কিছু ভোজনরসিক লস্যি তৈরি করতে গিয়ে গোদরেজ ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেছে।
- ১৯৪৪ সালে মুম্বাই ডকইয়ার্ডে বিস্ফোরণে অনেক লোক হতাহত হয়, শুধু গোদরেজ সেফস্গুলো অক্ষত ছিল।
- ১৯০৯ সালে আর্দেশির গোদরেজ স্প্রিংবিহীন তালা আবিষ্কার করেন এবং রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের সিলযুক্ত প্যাটেন্ট লাভ করেন।
- ১৯৫৫ সালে গোদরেজ এন্ড বয়েস প্রথম ভারতীয় টাইপরাইটার উৎপাদন করে।
- গোদরেজ গ্রুপ প্রথম ভারতে ফ্যাক্স মেশিন, ওয়ার্ড প্রসেসর এবং ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার নিয়ে আসে।
- ১৯৯৭ সালে গোদরেজ গ্রুপের ১০০ বছর উপলক্ষে ভারতীয় ডাকবিভাগ বিশেষ স্ট্যাম্প বের করে।

২০১৪-য় শিল্প-সাম্রাজ্য

রিয়েল এস্টেট, কম্পিউটার হার্ডওয়ার, মেডিক্যাল ডায়াগ্নস্টিক, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া আউটসোর্সিং, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ব্যবসায় প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ে আজ গোদরেজ গ্রুপের ৪১০ কোটি ডলার (২৫ হাজার কোটি ভারতীয় রুপি) খাটছে। গোদরেজ পরিবারের চতুর্থ প্রজন্ম অত্যন্ত দড়্গতার সঙ্গে ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে।

আদি গোদরেজের সন্তানরা তানিয়া দুবাশ, নিসাবা গোদরেজ ও পিরোজশা গোদরেজ গ্রুপ-কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছেন। দুবাশ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান ব্রান্ড অফিসার। নিসাবা গোদরেজ কনজ্যুমার প্রোডাক্ট লি.-এর নির্বাহী পরিচালক। তাদের ভাই পিরোজশা গোদরেজ প্রপার্টিজ্ লি.-এর প্রধান। জামশিদের ছেলে নভরোজ গোদরেজ ২০০৫ সালে কোম্পনিতে যোগ দিয়েছেন– দেখাশুনো করছেন গোদরেজ এন্ড বয়েস-এর উদ্ভাবনের দিকটি।

গোদরেজ গ্রুপের কর্মীসংখ্যা ২২ সহস্রাধিক এবং বিশ্বের ৬০টির বেশি দেশে তাদের ব্যবসায় ছড়িয়ে আছে। ২০১১ সালে প্রবৃদ্ধির উচ্চাকাঙ্ক্ষী লড়্যামাত্রা ১০x১০ নির্ধারণ করা হয়। গোদরেজ গ্রুপ অনেক বছর ধরে এরকম লড়্যামাত্রাই অর্জন করে চলেছে।

• wbR¯^ cÖwZ‡e`b

আমার বাবা

হোসেনউদ্দীন হোসেন

আমার বসতভিটেয় পদচ্ছাপ কার?
সে-তো আমার জন্মদাতা প্রিয়তম বাবার।

ওই উঠোনে লেপ্টে আছে কাদামাটিধুলো
ওইখানেতে গোয়াল ছিল থাকত গরুগুলো
গৃহপালিত পশুর সেবায় যত্ন ছিল কার?
সে-তো আমার জন্মদাতা প্রিয়তম বাবার।

এই উঠোনে ধানের গন্ধে বাতাস হত মাতাল
মটর-কলাই শস্যদানায় ভরে থাকত চাতাল
ভোর বেলাতে পাখির সাথে গলা শুনতাম কার?
সে-তো আমার জন্মদাতা প্রিয়তম বাবার।

ঘাড়ে লাঙল মাথায় গামছা বাতাসে দুলত কার?
সে-তো আমার জন্মদাতা প্রিয়তম বাবার।

কব্জি ছিল শক্তপোক্ত চওড়া ছিল কাঁধ
শরীর ছিল এবড়ো-থেবড়ো বক্ষে ছিল খাদ
বিপদ এলেই ছুটে যেতেন– কার ছিল হুঙ্কার
সে-তো আমার জন্মদাতা প্রিয়তম বাবার।
দস্যু-দানব ভেগে যেত বাবার গলার তেজে
একলা তিনি মহড়া দিতেন বীরের মত সেজে
এমন সাহস এই দিগরে আর বা ছিল কার?
সে-তো আমার জন্মদাতা প্রিয়তম বাবার।

তিনিই ছিলেন মাটির মানুষ তিনিই ছিলেন চাষা
মাঠ ফসলের রক্ত ঘামে ছিল ভালবাসা

মাটির সঙ্গে মাঠের সঙ্গে সখ্য ছিল কার?
সে-তো আমার জন্মদাতা প্রিয়তম বাবার।

অণুকাব্য

খোশনূর

হাত ধরেছ
বেশ করেছ
মন ভরেছ কি
মন দেব না
মন নেব না।

রঙ বদল

কানাই সেন

বেঁচে থাকতে গেলে অনেকটা সময় কাটে
সুখ-দুঃখের জটিল আবর্তে– সময়টার নাম
দিলাম জীবন। কারো পাশাপাশি কিছুটা পথ
চোখে চোখ, উষ্ণ সময়, কিংবা অকারণ
চোখের জল– সে সময়ের নাম দিলাম
প্রেম। দারুণ গ্রীষ্মের বিকেলে করুণাধারার
মত ঝরে পড়া বৃষ্টির নাম– সুখ। দুঃখ
নাম দিলাম কারো অভিমানী চোখের জলের।

এসব নামের খেলা নিতান্ত তাৎক্ষণিক
ছেলেমানুষি কাটাকুটি– চক্রাকারে ফিরে আসে
হারজিৎ। সময়ে নাম বদলায়– একই চেনা ছবি
সোজা কিংবা উল্টো। তাই যে-কোন বিষণ্ন
সন্ধ্যায় মুহূর্তে জীবনের নাম বদলে বলতে পারি
মরণ। প্রেমকে নিশ্চিত চিনতে পারি ঘৃণা
নামে। সুখ নিমেষে হারায় দুঃখের ভিড়ে,
দুঃখ হঠাৎ বদলায় সুখের সাত রঙে ॥

ভারতের কবি

তোমার হাত

অমিতাভ চক্রবর্তী

তোমার হাত ধরব বলেই
এই হাত বাড়ালাম...
মেপেই দেখ আমার হাতের উষ্ণতা
ধরেই দেখ আমার হাতের শীতলতা!

তোমার বাড়ি যাব বলেই
সাত-সকালে পা বাড়ালাম;
তোমার মুখ দেখব বলেই,
মধ্যরাতেই রওনা হলাম।

খোলা জানালা, খোলা দরজা,
আজও খোলা আমার দু'টি চোখ,
তবু কেন প্রিয়তমা, এই শরতে,
তোমার মুখে, কিসের গভীর শোক?

অনেক কথা আছে আজ, যা এক-ডুবে
আকাশগঙ্গা পার হয়ে যায়;
অনেক ব্যথা আছে, যা এক নিমেষে,
রামধনুর রঙীন ডানায় মুখ লুকোয়!

অমিতাভ চক্রবর্তী ভারতের কবি

শীত, নখদন্তে

হামিদ রায়হান

এখনো তোমাকে ভাবি রক্তে মাংসে টানা দিনগুলো
আমার মগজে বইছে ছলছল শব্দে আলপিন
গ্রীষ্ম, এ বিস্ময় ততদিনে আমি হব তোমার অতিথি
রক্তে আমার নিরোর পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে

মাথার ভিতরে উগরে পড়ছে সবিস্ময়ে প্রজাপতি
রক্তে শর্করা ভাঙছে। চাউনি পড়ছে পথে, মাঠে।
ভ্রার্তৃত্বের থেকে গলে গলে পড়ছে মাছের পেটি,
ভরসন্ধ্যে সব ফুল ঝরে গিয়ে মাটিতে লুটাচ্ছে

পাশের বাড়ি সুইমিংয়ে মধ্যরাতে পরী স্নান করছে
ওদের নীরব আর্ত আঁচড়ে পড়ছে ভোরবেলা
মওকা বুঝে ঢুকে পড়ি দ্রাক্ষাবনের গহীনে
সংরক্ষিত এলাকায়, ঝুলে পড়ি শাখা-প্রশাখায়
আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে শীত
চুপকাতর আকাঙ্ক্ষা অনাবৃত করে জুলেখার রূপ।

মৃত ছায়াদের রং

সোহেল মাহবুব

কতটা আঁধার পেলে একটি রাতের ষোলকলা পূর্ণ হয়?

সারা ঘরময় নিরঙ্কুশ সমুদ্রের গর্জন
সন্ধ্যায় বিপন্ন বিকালের বেহাগ বিপর্যয়
সেই মুহূর্তে চাঁদের শাড়ির আঁচলে কেঁপে কেঁপে ওঠে উষ্ণতা
নরম নৈঃশব্দের মত প্রগাঢ় তৃষ্ণারাও ঝরে ঝরে পড়ে
সূর্যের সন্ধ্যায়িত জমাট বাঁধা তৈলাক্ত চিটচিটে বালিশে।

যদি এই মৌসুমেই খসখসে পাতাগুলো ঝরে পড়ে
বালক আকাশের, তবে ফিতা খুলে রাখাই যৌক্তিক হবে
নিয়ন বালিকার। তারও তো সাঁড়াশি ঝরনা বইতে শুরূ করেছে
এখন কে আগলাবে বাল্যঘাসের ডগা?
কারণ নদীর প্রতিটি ধাপে ধাপে সুগন্ধা ঘোলা জল
লবণের বালাই নাই এক রত্তি।

কতটা আঁধার পেলে নীরব সকাল থেকে গোধূলি রাতের ঢেউ তোলে?

ছায়ারা মৃত কী-না জানা নেই ক্ষত শুকানো রোদের
এখন তো সমতলে শুয়েও কৃষাণি শুনতে পায়
অগ্ন্যুৎপাতের ঢেউ, সারি সারি নির্জনতা
উপরে-নিচে আঁধার এখন সারাক্ষণই রাত।

গ্রহণ

রীনা তালুকদার

মেলায় গিয়ে টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ দেখা
ছোট বড় সিম্বলের হরেকরকম লেখা
লোকটি সুরে সুরে আঁকা ছবির বর্ণনা দিয়ে যায়
দেখার চেয়ে শোনার আনন্দে মন ভরায়
শুনলেই শেষ হলে প্রয়োজন...
দেখে লাগিও না চন্দ্রে গ্রহণ
চাঁদ পৃথিবীকে গোগ্রাসে গিলে ফেললে
মহাবিস্ফোরণ উল্টো দিকে ফিরবে।

অণুকাব্য

সোনিকা আহুজা

অন্ধকার নীলাকাশ, ধ্রুবতারার দীর্ঘশ্বাস
ভালবাসার চন্দ্রিমা, স্বপ্নপারের পূর্ণিমা
নিস্তব্ধ চারপাশ, স্মৃতিময় নিঃশ্বাস
অবরুদ্ধ কারাবাস, অভিনয় আশ্বাস।

দুই.
দুঃখের বৃষ্টি ঝরে জীবনের আকাশে
সুখের সৃষ্টি নিঃশেষ বিষণ্ন চারপাশে
রক্তাক্ত হৃদয় অঙ্গার অজানায় বিলীন
জীবনের পথে স্বপ্নগুলো হঠাৎ মলিন।

তিন.
দুঃখরা চারপাশে করে কলরব
এলোমেলো মনে কন্যা নীরব
লালাভ আকাশ শূন্য হৃদয়
আবছায়া ক্ষণ সুখের বিদায়।

চার.
মরীচিকায় আর্তনাদ বিবর্ণ স্মৃতির প্রহর
জানালায় আবছায়া বেদনার নীল শহর
অচেনা জ্যোৎস্নায় জীবন কোন নীরবতায়
অদেখা ভুবনে বিষণ্ন মনবাড়ি অস্থিরতায়।

সোনিকা আহুজা
পঞ্জাবের লুধিয়ানার কবি

অনুবাদ জাকির হোসেন উপকূল

মুক্তিযুদ্ধ

ঐতিহাসিক ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদান

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান পশ্চিমসীমান্তে বিমান হামলা দিয়ে ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়, সে রাতেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা দিলেন: 'আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল।' সমস্ত শরণার্থী শিবিরে উলুধ্বনি দিয়ে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এ যুদ্ধের আহ্বানকে স্বাগত জানানো হল। ভারত সরকার এদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের যুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে। ভারতের লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাক-বাহিনির আত্মসমর্পণের সংবাদ জানান। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে ভারতের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনির অত্যাচার, নির্বিচার গণহত্যা, এক কোটি বাঙালিকে ভারতে আশ্রয়দান, প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের পাক-অত্যাচার ও গণহত্যাকে 'আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে'র অজুহাত প্রতিহত করে বাইরের পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ ছিল উলেখযোগ্য। ভারতে অবস্থানরত এককোটি শরণার্থী যাতে দ্রুত দেশে ফিরে যেতে পারে সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এপ্রিল-মে থেকেই চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু প্রথমাবস্থায়, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রভাবশালী একটি দেশের বিরুদ্ধচারণে ভারতের সেই প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি। অন্যদিকে তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী বন্ধু হওয়ায় ধনিক পশ্চিমাবিশ্ব তাৎক্ষণিকভাবে সেদিন এগিয়ে না এলেও ওইসব দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, মুক্তি

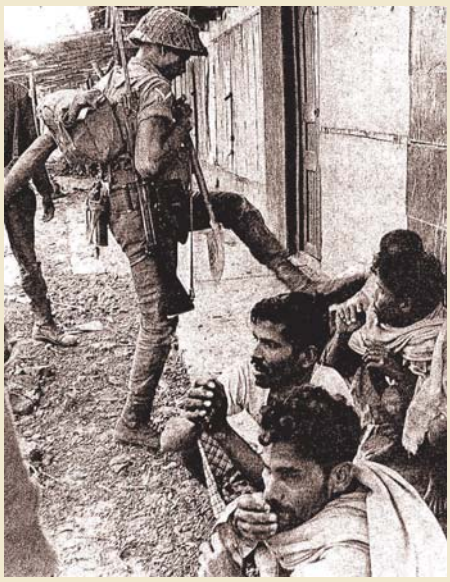

আগস্ট মাসের ১ তারিখে নিউইর্য়কের মেডিশন স্কোয়ারে জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা সারা বিশ্বের বত্রিশ নাড়িতে ঝাঁকুনি দিল। এ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা আর জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গীতে বিধ্বস্ত বাঙালি শরণার্থীর বাঁচার আর্তনাদ এক শক্তিশালী মানবিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার ছায়া সারাবিশ্বের জনমনে, জাতিসংঘের আলোচনায়, কূটনৈতিক সম্পর্কে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ভারতের বাঙালি শরণার্থী সমস্যা বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সহযোগিতার ও সহমর্মিতার এক অনন্য মানবিক অস্ত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

ও শান্তিকামী সাধারণ মানুষ শরণার্থীদের সাহায্যার্থে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। ভারত সরকারের যখন এমন দুর্দিন, পাকিস্তান ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলো যখন প্রতিনিয়ত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রকাশ্য অভিযোগ করছে, ওই রকম অবস্থাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাহস হারাননি। ভারত তার জাতীয় স্বার্থ ও পূর্বাঞ্চলের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার স্বার্থেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে শরণার্থীদের বর্মহিসাবে ব্যবহার করেছে। আমরাও আমাদের জাতীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। লোকসভায় সরকারি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে বিপবী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা, শরণার্থীদের আশ্রয়দান, যুবশিবির স্থাপনে সাহায্য ও মুজিব বাহিনিকে প্রশিক্ষণ, নিয়মিত বাহিনি তথা সেকটর কমান্ডার সেনাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, রসদ ও সর্বপ্রকার সাহায্য, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন, বিশ্বব্যাপী গণসংযোগ ও প্রচার, প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারকে সব রকম সহযোগিতা প্রদান।

জুন মাস থেকেই ভারতীয় সেনা প্রশিক্ষকদের অধীনে বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনির নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পরাশক্তির আসল দৃষ্টিভঙ্গি কি তা সরেজমিনে জানার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরন সিং যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ সফর করেন। ভারতের পক্ষে শুরু থেকেই ১ কোটি শরণার্থীকে (শরণার্থীর ২০ শতাংশ ছিল মুসলিম) বোঝা বেশিদিন সামলানো অসম্ভব হবে– এ পটভূমিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতের নীতি পরিবর্তিত হতে থাকে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরন সিং শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিক পরিম-লে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী সমস্যা সমাধানে শেখ মুজিবকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দেন। এই নীতির প্রথম পরিবর্তন প্রকাশ পায় ৯ আগস্ট '৭১ স্বাক্ষরিত ২০ বছরের ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিতে। চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের জন্য বিশেষ বার্তাবহ ছিল। এই চুক্তিটি মুক্তিযুদ্ধের গতি ত্বরান্বিত করে– বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন মুক্ত এলাকায় গড়ে উঠতে থাকে। অক্টোবর মাসে ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শরণার্থী সমস্যার আশু সমাধানে এগিয়ে না এলে সে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে বাধ্য হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করার জন্যে শ্রীমতী গান্ধী নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে ততটা উদ্যোগী হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন জানানোর অভিযোগে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ শুরু করে। ভারত প্রকাশ্যে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগর্নি শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় বসে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দেন এবং গণহত্যা বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীশিবির ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অবস্থানরত প্রপীড়িত, নির্যাতিত এক কোটি শরণার্থীর পরিসংখ্যান ও সমস্যার আর্থসামাজিক ও রাজ নৈতিক বিশেষণসহ শরণার্থী সমস্যাকে ভারত বিশ্ববাসীর কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন ও ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। মার্কিন কবি এ্যালেন গিন্সবার্গ এ সময়কার একজন উলেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিট জেনারেশনের তিনি প্রধানতম কবি। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি কলকাতাসংলগ্ন ভারতীয় সীমান্ত ধরে বাংলাদেশের কাছাকাছি আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সীমান্ত অঞ্চলে শরণার্থীদের অশেষ দুর্দশা ও লাঞ্ছনাকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর অন্যতম দীর্ঘ কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' রচনা করেন। স্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে অর্থসহায়তা করার জন্যে তিনি বিশিষ্ট রুশ কবি ইয়েকগেনি ইয়েভতুশেঙ্কোর সঙ্গে একটি যৌথ কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। কবি এ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা এখন মৌসুমী ভৌমিকের সুরঝরা কণ্ঠে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে।

আগস্ট মাসের ১ তারিখে নিউইর্য়কের মেডিশন স্কোয়ারে জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট শরণার্থীদের দুঃখদুর্দশা সারা বিশ্বের বত্রিশ নাড়িতে ঝাঁকুনি দিল। এ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা আর জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গীতে বিধ্বস্ত বাঙালি শরণার্থীর বাঁচার আর্তনাদ এক শক্তিশালী মানবিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার ছায়া সারাবিশ্বের জনমনে, জাতিসংঘের আলোচনায়, কূটনৈতিক সম্পর্কে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ভারতের বাঙালি শরণার্থী সমস্যা বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সহযোগিতার ও সহমর্মিতার এক অনন্য মানবিক অস্ত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভারতের বুদ্ধিজীবীসহ বিশ্বনন্দিত যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর টেড কেনেডি, ফরাসি চিন্তাবিদ আন্দ্রেঁ মালরোঁ, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি, শ্রীমতী গান্ধীর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানিসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং পাশ্চাত্যের দেশসমূহ সফর, ওইসব দেশের জনগণ, নেতৃত্ব ও সংসদের সমর্থন অর্জন সম্ভব করে তোলে। জাতিসংঘের সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের শরণার্থী ও স্বাধীনতার বিষয় ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত প্রতিনিধির বাকযুদ্ধ ও আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অনন্য অধ্যায় হয়ে আছে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, এই উপমহাদেশের ইতিহাসে তথা বাঙালির জীবনে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে এক ভাষণে বিশ্ববাসীকে জানান, 'আজ আমরা বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি।' শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারণী সরকারি ভাষ্য ও বিবৃতি ভারত সরকার পাওয়ার পর গত রাতের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।' শ্রীমতী গান্ধী আরো বলেন, 'অবর্ণনীয় বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের ইতিহাস এক অনন্য অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। শুধুমাত্র ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিচার করেই স্বীকৃতি দিচ্ছি।... নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী হামলা প্রতিহত করার জন্য জীবনপণ সংগ্রামরত ভারতের জনগণ আজ একই লক্ষ্যের ও একই পথের পথিক।'

দৈনিক যুগান্তর, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত

প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ:
বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেল: 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে লোকসভায় ঘোষণা (দিলি-অফিস)
৬ই ডিসেম্বর– ভারত সরকার আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতির ফলে এই উপমহাদেশে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সকালে সংসদের যুক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেন এবং উভয় সভার সদস্যগণই দাঁড়িয়ে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

সেই সঙ্গে সংসদ কক্ষে প্রবল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয় এবং সদস্যবর্গ উৎসাহআ বেগে মিলিত ধ্বনি তোলেন, 'জয় বাংলা, 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের নতুন সরকার 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে। এই সভা নিশ্চয়ই চান যে, আমি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে আমাদের ঐকান্তিক সংবর্ধনা ও আন্তরিক অভিনন্দন পৌঁছে দিই। সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী গান্ধী একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বিরাট বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের' সূচনা করেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার ও জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যে একসঙ্গে কাজ করছেন, তা ভাল প্রতিবেশীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, একমাত্র এরূপ একটি নীতিই এই অঞ্চলে শান্তি, স্থায়িত্ব ও প্রগতির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতে আগত শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের এবং তাঁদের জমিজমা ও জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য পুনরায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। ভারত স্বাভাবিকভাবেই এই প্রচেষ্টা কার্যকরী করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। বেলা সাড়ে দশটার সময় শ্রীমতী গান্ধী এই নাটকীয় বিবৃতি প্রদানের জন্য উঠে দাঁড়ান এবং বিবৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি ওঠে। শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রসঙ্গে এলে লোকসভায় অভূতপূর্ব উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়; সদস্যগণ দাঁড়িয়ে উঠে বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে ঐতিহাসিক ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।

বিশ্ব মানচিত্রে নূতন চিত্র বাংলাদেশ

ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতি দান

আমাদের মহান বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের লোকসভায় গত ৬ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে বৈধ সরকার বলে ঘোষণা করেন। ভারত সরকারের সময়োপযোগী এই সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের এক বিজয় ঘোষিত হল। শ্রীমতী গান্ধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতের লোকসভায় বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মাধ্যমে মিসেস গান্ধীর এই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে সংসদের অধিকাংশ সদস্য সমর্থন জানান। এই ঘোষণার পর সভার সদস্যগণ আনন্দের পাবনে এমনভাবে আত্মহারা হয়ে পড়েন যে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সভার কাজ স্থগিত হয়ে যায়। এরপর লোকসভার সদস্যরা নয়াদিলিস্থ বাংলাদেশ মিশনে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধির সহিত করমর্দনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ ও তার জনক শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান। ভারতের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনচেতা জাতি এগিয়ে আসে। ভুটানের মানবপ্রেমিক রাজা মি. জিগমে ওয়াংচুক বাংলাদেশের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেন। অপরপক্ষে জাতিসঙ্গে বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকা, চিন ও মার্কিন প্রস্তাবের প্রতি তিনবার ভেটো প্রদান– ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে।

আজ থেকে ৪৩ বছর আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, সোমবার (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮) বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। এদিন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এদিন রণাঙ্গনের অবস্থা আরো উত্তপ্ত, সম্মিলিত মিত্রবাহিনির আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদররা দি শেহারা। যশোর দখলের জন্য সম্মিলিত মিত্রবাহিনি প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধ চালালে পাকিস্তানি বাহিনি খুলনার পথে পালাতে শুরু করে।

এদিন লোকসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারণী বিবৃতিলাভের পর গত রাতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের ইতিহাস এক অনন্য অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে আমরা স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিইনি। বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিচার করেই স্বীকৃতি দিচ্ছি। নিজেদেও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণ এবং ভারতের জনগণ আজ একই লক্ষ্য ও পথের পথিক। উলেখ্য, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সপ্তাহান্তে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর গোপনীয় বার্তায় বলেন, 'আমাদের দুই দেশের মধ্যে স্বীকৃতি ও আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হলে পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রের বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ ভূমিকা আরো জোরদার হবে।'

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বামপন্থী রাজনীতিবিদ বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন: 'আওয়ামী লীগ ভারত সরকারের ওপর বাংলাদেশ স্বাধীন করার দায়িত্ব অর্পণ করে নিজেরা কেবল সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে।... পূর্ব পাকিস্তান দখলের জন্য ভারত সরকার কোন তাড়াহুড়ো করেনি। পাকিস্তানিদের ফ্যাসিস্ট গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে জনমত গঠিত হওয়া এবং শীতের আগমনের পর উত্তর থেকে চিনের আক্রমণের আশংকা না থাকায় তারা পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। ভারতীয় সামরিক শক্তির কাছে

পাকিস্তানের বিধ্বস্ত ও জনবিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনি ১৯৭১এর ১৬ ডি সেম্বর আত্মসমর্পণ করে। এ আত্মসমর্পণ চুক্তি যেভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মধ্যেই ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সত্য চরিত্র লিখিত আছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের যে ছবি গুরুত্বপূর্ণ সহকারে প্রকাশিত হয় তাতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আওয়ামী লীগ বা বাংলাদেশী মুক্তিবাহিনীর কোন প্রতিনিধি থাকেননি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনির ডেপুটি কমান্ডার এয়ার ভাইস মার্শাল খোন্দকারকে দেখা যায় পেছনের দিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় অবলোকনকারীর ভূমিকায়। উপস্থিতি ছিল তাদেরই যাদের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। একদিকে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষ নিয়াজি এবং অন্যদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়েছিল যে আওয়ামী লীগ নয়, ভারতীয় সরকার বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল।' (*দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা ১৬.১২.১২)

১৪ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনির সদস্যগণ হত্যা করে দেশের বাছাবাছা শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের। মুক্তিযুদ্ধের এই মহান বিজয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। মুজিব নগর থেকে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও সচিবালয় স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় ২২ ডিসেম্বর '৭১ তারিখে। পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে প্রায় ত্রিশ লাখ বাঙালিকে। লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকসহ সংখ্যালঘুদের ওপর অমানষিক অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন চলে ও নারীদের সতীত্ব হারাতে হয়। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে লেখা হল মুক্ত বাংলার স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস। পূর্ণ হল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা স্বপ্ন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষ্যমতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিয়ে পূর্ণ হল বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন।

কলকাতার *দৈনিক আজকাল* পত্রিকায় অন্য এক নিবন্ধে বাম রাজনীতিবিদ বদরুদ্দীন উমর লিখেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের মত একটি পেটি বুর্জোয়া রাজনৈতিকদল পাকিস্তানিদের সঙ্গে মুখোমুখি রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রায় এককভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল। মূলত একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল হলেও আওয়ামী লীগ তৎকালীন রাজনৈতিক স্রোতধারার মূলদিকটি নির্ধারণ করতে পেরেছিল এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তারা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল ।' (*আজকাল*, কলকাতা, ১৯ আগস্ট '৮৭)।

মুক্তিযুদ্ধকালে পাক বাহিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর বিচার করেই ক্ষান্ত ছিল না– এছাড়া যাঁদের অনুপস্থিতিতে বিচারের উদ্যোগে নিয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রথম দফায় ২১.৪.৭১ তারিখের ঢাকার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আব্দুল মান্নান (টাঙ্গাইল) তোফায়েল আহমদ এবং *দি পিপলস* দৈনিকের সম্পাদক আবিদুর রহমানকে ২৬.০৫.৭১ তারিখে ঢাকায় ১নং সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল এবং (*স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*: ১৫ খ-, পৃষ্ঠা৪৫) নূরইআলম সিি দ্দকীসহ প্রায় সব মিলিট্যান্ট যুব ছাত্রনেতা, আবু সাইদ চৌধুরী, এমএজি ওসমানী, ১৩জন সিএসপি ও ২২জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্তত ৫৫জন কর্মকর্তা এবং অধিকাংশ এমএনএ/এমপিএর অনুপস্থিতিতে পাকবাহিনি একই ধরনের বিচার ও শাস্তি প্রদান করেছিল।

ভারত ভাগের পর পঞ্জাব তাঁদের সমস্যা স্থায়ী সমাধান করেছে কিন্তু বাংলা তা পারেনি বা করেনি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে যশোর মুক্ত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মুজিবনগর সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুক্ত যশোরের জনসভায় জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও পিডিপি এই চারটি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সংবিধানের অর্ন্তভুক্ত হয়। পঁচাত্তরের পর সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় মুক্তিযুদ্ধের দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর থেকে প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও তাদের নীতির প্রবণতা থেকে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে– মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিচ্যুত হয়েছে– উগ্রসা ম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর কাছে বাংলাদেশের সংবিধান ও সংখ্যালঘুর অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শতশত বছরের গড়ে ওঠা সামাজিক চুক্তি। সৃষ্টি হয়েছে দেশের মধ্যে এক অবিশ্বাসের পরিবেশ ।

একাত্তরের ষোল ডিসেম্বর আমরা শরণার্থী জীবনের অশ্রুর ক্ত-মৃত্যুর সাগর পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশের' নাগরিক হিসাবে ফিরে এসেছিলাম। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার অর্থ ছিল পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের সমাধি রচনা করে 'জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সেক্যুলার বাংলাদেশে' ফিরে আসা। পাকিস্তানি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দ্বারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে অস্বীকার করেছে বলেই পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিকামী বাঙালি শরণার্থী অমুসলিম জনগোষ্ঠী নাগরিকদের কাছে অসাম্প্রদায়িকতার অর্থ ছিল 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'। স্বাধীন বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িকতার অর্থ ছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আর্দশে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সুস্থ ও সম্মানজনক জীবনযাপন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম আদর্শ হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন ছিল সেই আদর্শেরই স্বীকৃতি। ত্রিশ লক্ষ শহীদ, কয়েক লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম, মুক্তিযোদ্ধার নিবেদিত দেশপ্রেম ও এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর অশ্রু-রক্তত্ ্যাগ তিতিক্ষা দিয়ে অর্জন করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। কোন একটি অংশকে ছোট করে বা অস্বীকার করার অর্থ বাংলাদেশকে দুর্বল করা। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা কারো বা কোন দলের রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি জনগণের ও ব্যক্তির দেশপ্রেমের অর্জিত সম্মান। তাঁদের রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সম্মান দেবে কি দেবে না, এটা সরকারের নেতৃত্বের নীতিনির্ধারণী বিষয়। বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা আর জন্মগ্রহণ করবে না, রাজনীতিক বা দলীয় কর্মী প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করবেন কিন্তু স্টেটসম্যান বা নেতা খুব কমই জাতির ভাগ্যে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী মুক্তিযোদ্ধা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও গবেষক

মুক্তিযুদ্ধ

বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

বইটি আমার সর্বোপরি ভাল লেগেছে এবং উপর্যপুরি ভাল লেগেছে কারণ যদ্বিবা কখনও বইটির কোন পাতা বা অধ্যায় একাধিকবার পড়তে গিয়েছি তখনও নতুন করে চমৎকৃত হয়েছি। এক কথায় এটি একটি চমৎকার প্রকাশনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হয়তো নিজেরাও জানেন না যে সামগ্রিকভাবে কতটা অনবদ্য হয়েছে বইটির গাঁথুনি। যে জিনিসটি আমাকে বিস্মিত করেছে সেটা হচ্ছে বিষয়বস্তুর নিখুঁত মিশ্রণ এবং প্রতিটি লেখার বহুমাত্রিক রূপ। 'মুক্তিযুদ্ধ' এমন একটা বিষয় যেটা নিয়ে লিখতে গেলে উপাত্তের অভাব হয় না, কিন্তু এই বইটিতে বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, চিন্তার বিচ্ছুরণ ঘটতে বাধ্য। মুক্তিযুদ্ধ কেন মানবমুক্তির যুদ্ধ– সেই প্রশ্নটির বহুমাত্রিক সমাধান বা উত্তর সাজানো আছে এর শব্দেশ ব্দে, অক্ষব্লেঅ ক্ষরে। আমি এরজন্য বলছি এটা একটা চমৎকার মিশ্রণ হয়েছে কারণ লেখাগুলো তত্ত্বত থ্যের দিক দিয়ে যেমন উচ্চমার্গীয় তেমনি ভাষাগত সাবলীলতা, জনজীবনের সম্পৃক্ততা, আবেগীয় অনুভূতি ও চেতনার শক্তিমান মেলবন্ধন– সবকিছুর প্রতিফলন একসঙ্গে ঘটানো কোন সহজসাধ্য বিষয় নয়। সম্পাদনার কাজে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভূয়সী প্রশংসার দাবিদার। বইটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলে প্রথমে যে ধারণাটির উদয় হয় তা হল, ইতিহাসসমৃদ্ধ ভাবগম্ভীর কোন বই– যার আভাস রয়েছে বইটির নামে, লেখকদের পরিচিতিতে এবং যে আয়োজনকে কেন্দ্র করে এর প্রকাশনা সেই আয়োজনের উদ্দেশ্যতে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাঠক যখন বইটিতে ডুবে যাবেন– তাঁর ধারণা আমূল পাল্টে যাবে। মুক্তযুদ্ধভিত্তিক বইগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণে এই বইটি অনেক অর্থেই অন্য বই থেকে আলাদা এবং স্বকীয়। লেখাগুলোতে নিবিড় গবেষণার ছাপ আছে, বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন আছে, ইতিহাসের ব্যবচ্ছেদ সুস্পষ্ট– কিন্তু বইটির ভাষা এতটাই প্রাঞ্জল যে, এই জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো মস্তিষ্ক থেকে মনকেও নাড়া দিয়ে গেছে।

> নতুন প্রজন্ম যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি তাঁদের জন্য এই ইতিহাসটুকু জানা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আদিবাসীদের অবদানকে জানা এবং জানানো। আমরা স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে যে পাঠ্যবই তুলে দিচ্ছি তাতে আদিবাসীদের পরিচিতি থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদানকে কোথাও কেউ প্রকাশ করেননি। আমার খুবই ভাল লেগেছে বইটির এই সুপরিসর প্রবন্ধে আমাদের আদিবাসী বীরেরা সসম্মানে আলোচিত হয়েছেন।

এ যেন সীমার মাঝে অসীমকে পাওয়া। পরিসংখ্যানের সঙ্গে যেমন কবিতা মিশেছে, তেমনি তত্ত্ব উপাত্তের সঙ্গে উপন্যাসের আবহ মিশে গিয়েছে লেখায়। স্মৃতিতে যেমন '৭১কে প্রতিফলিত করা হয়েছে একইভাবে সাম্প্রতিক মতবাদে '৭১কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এত অল্প পরিসরে এত বেশি অজানা তথ্যের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে যে পাঠক অবশ্যই পুলকিত হবেন, উপকৃত হবেন, উদ্বেলিত হবেন। এখানে যেমনভাবে বীরশ্রেষ্ঠদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে তেমনিভাবে উঠে এসেছে অজানা অনেক শ্রেষ্ঠবীর অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা। যেমনিভাবে বাংলাদেশের যোদ্ধাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে তেমনিভাবে জানানো হয়েছে অসংখ্য ভারতীয় বীরসেনার উপাখ্যান যাঁরা অন্য একটি দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন।

এই বইটি পড়ে পাঠক ইন্ডিয়ান আর্মির সিপাই এলবার্ট এক্কা কে চিনবেন। তাকে চিনিয়ে দেবার জন্য লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বইটিতে সুদূর অতীত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা নইলে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকে জানা হয় না– তেমনি যুদ্ধকালীন কূটনৈতিক ইতিহাসের খুঁটিনাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে পাঠককে জানানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে যেমন আলোকপাত করা হয়েছে, তেমনি সমসাময়িক সকল রাজনৈতিক নেতার অবদানকে সশ্রদ্ধচিত্তে আলোচনা করা হয়েছে। কিশোর মুক্তিযোদ্ধার চাঞ্চল্য কিংবা পঞ্চাশোর্ধ আদিবাসী যোদ্ধা সাংমা'র প্রত্যয় এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে কারণ মূলমন্ত্রটি ছিল 'স্বাধীনতা' আর অধ্যায়টা ছিল 'আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রাজ্ঞজনদের কীর্তিকে উন্মোচিত করা হয়েছে। সহযোদ্ধাদের পারস্পরিক সৌহার্দের দৃষ্টান্ত পড়ে আবেগতাড়িত হতে হয়েছে, তেমনি ইন্ডিয়ান আর্মি বা পাকিস্তানি আর্মির নেতৃস্থানীয়দের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা পড়ে গর্বে মাথা উঁচু হয়েছে। দেশের জনযুদ্ধ যেমন পাঠককে বিচলিত করেছে, তেমনি ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে অবর্ণনীয় জীবনযুদ্ধের চিত্র নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। রাশি রাশি পরিসংখ্যান, যুদ্ধবিবরণ, যোদ্ধা বিবরণ; এসবের মধ্যেও নজরুল, শামসুর রাহমান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা জড়িয়ে ধরেছে বইটির প্রবন্ধগুলো। সেই সময়কার সাংস্কৃতিক আবহ এই সময়ে বসে পড়লেও শব্দাবলী হৃদয়ে উষ্ণতা ছড়িয়েছে। আমি আবারও চমৎকার মিশ্রণের উল্লেখ করতে চাই। যেমন, আনিসুল হকের 'মা' উপন্যাসটির রিভিউ বা বিশ্লেষণ এই বইটিতে সংযুক্ত না হলেও পারত কিন্তু এই সংযোগের ফলে একটা অচিন্তনীয় সুখবোধ বা তৃপ্তি জড়িয়ে ধরবে পাঠককে। যতটাই কঠোর সেই মুক্তিযুদ্ধ ততটাই কোমল কিন্তু শক্তিময় এই শহীদ জননীদের উপাখ্যান। আসলে বইটি অসংখ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে– বহু আজানা ভাষ্য জেনে দৃষ্টিভঙ্গির নানান দুয়ার খুলেছে।

'বোমা হামলার ভয়ে তাজমহলকে গাছপালা দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছিল।

'মুর্খ কৃষককে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে 'লেফ্‌ট্‌রাইট' বোঝানো যাচ্ছে না– অগত্যা প্রশিক্ষক তার এক পায়ে ঘাস এবং এক পায়ে ধান বেঁধে দিয়ে শেখালেন 'ঘাস প্লাধান পা'।

'বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর তার বেতন চারশো পঞ্চাশ টাকা থেকে প্রতিমাসে চারশো ত্রিশ টাকা মেহেদীপুরের পাশে রিফিউজি ক্যাম্পে থাকা বিধবা মহিলাদের দিয়ে দিতেন। অসম্ভব সাহসী এই শহীদ যোদ্ধার মরদেহ খুঁজে পকেটে বিশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

'দশ লক্ষ শরণার্থীকে দীর্ঘ সময় আশ্রয় দিতে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের অসাধারণ ত্যাগ।

'সলিল চৌধুরী, মান্না দের মত শি ল্পীদের আর্থিক সহায়তা দানের কথা।

এরকম প্রচুর হৃদয়গ্রাহী সত্যভাষ্য পাঠককে আপস্নুত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

দু'টি বিষয়ের ওপর না বললেই নয়। প্রথমত ব্যাপক পরিসরে বইটিতে আলোচিত হয়েছে ভারতের অবদান এবং দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের আদিবাসীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। বইটির প্রকাশনা ভারতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা পর্বের প্রেক্ষিতে ঘটেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চারদশক পূর্তি উপলক্ষে ২০১১ সালের ১৬১৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ আছে বইটিতে, ভারতের পক্ষেও যোগ দিয়েছিল গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা এই বইটিতে মুখ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ কেউ দোষ খুঁজতে পারেন, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এই তথ্যগুলি জানাটাও জরুরি এবং যুক্তিযুক্ত। তৎকালীন সময়ে ভারতের সহযোগিতার কথা উপেক্ষা বা অস্বীকার করা কোনটাই সম্ভব না বরং নীতিগতভাবে এই ইতিহাসটুকু না জানলে মুক্তিযুদ্ধকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একটি প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র কর্মকা- ব্যাপক পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে যার অনেক কিছুই আমার জানা ছিল না। প্রথিতযশা লেখক দেবেশ রায়ের 'শিকড় শিকড়ই থাকে' রচনাটি এই বইয়ের একটি অপরূপ অলংকার। আসলে দু'টি দেশের জনগণের আত্মিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে কখনও এক করে দেখা যাবে না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের যে অবদান তার সঙ্গে বর্তমান রাষ্ট্রীয় বা কূটনৈতিক সম্পর্কের যোগসূত্রে না যাওয়াই ভাল। বইটি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক, তাই সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রজন্ম যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি তাঁদের জন্য এই ইতিহাসটুকু জানা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আদিবাসীদের অবদানকে জানা এবং জানানো। আমরা স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে যে পাঠ্যবই তুলে দিচ্ছি তাতে আদিবাসীদের পরিচিতি থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদানকে কোথাও কেউ প্রকাশিত করেননি। আমার খুবই ভাল লেগেছে বইটির এই সুপরিসর প্রবন্ধে আমাদের আদিবাসী বীরেরা সসম্মানে আলোচিত হয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ– সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বইটি অনন্যসাধারণ। সাধুবাদ জানাই প্রত্যেক লেখককে। সম্পাদনার কাজটি যারা করেছেন ধন্যবাদ তাঁদেরকে। মানবেতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যার মধ্যে দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশকে জায়গা তৈরি করতে হয়েছে। এই বইটি মুক্তিযুদ্ধকে চর্চা করবার জন্য আদর্শ। এটি পড়বার মত একটি বই, সংগ্রহে রাখার মত একটি বই, উপহার দেবার মত একটি বই, নিজেকে এবং জাতিকে সমৃদ্ধ করবার মত একটি বই, নিজস্ব চিন্তাকে বিচ্ছুরিত করবার মত একটি বই।

আমি চাইব সবাই বইটি পড়বেন, জানবেন, দেশকে ভালবাসবেন, দেশের জন্য কাজ করবেন যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে। দেশ গড়ার কাজটা এখনও অসম্পূর্ণ।

অধ্যাপক **ড. সহিদ আকতার হুসাইন**
উপ্লউপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

আজ হাস্নুহেনা ঢাকায় যাবে।

চম্পা আর পদ্ম উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে বলে, হাস্নুবু ঢাকায় যাইব। গার্মেন্টে চাকরি করব। দুনিয়াদারি চিনা ফেলব। হাস্নুবুর রানির কপাল।

ঘুরতে ঘুরতে চম্পা থমকে দাঁড়িয়ে বলে, হাস্নুবুর ভাগ্য কি সত্যি রানির মত হবে?

পদ্ম মুখ ভেংচি দিয়ে বলে, রানি কি?

তাহলে যে একটু আগে বললাম, রানির কপাল।

আমরা এমনি এমনি বলেছি। আমরা দুইজন তো বোকার ডিম। খোলস থেকে বের হইনি।

পদ্ম কথা বলে হি হি করে হাসে। চম্পা হাসে না। ওর ভাবনায় ঘূর্ণি, সত্যিতো রানি কি! আমরা কখনো রানি দেখেনি। মুহূর্তে দু'জনে হি হি করে হাসতে হাসতে বলে, ওই যে রানি।

রান্নাঘরের দরজার কাছে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বেড়ালটির দিকে দু'জনে একসঙ্গে আঙুল তোলে। পদ্ম বলে রানির অভ্যাস চুরি করে খাওয়া। আড়িমুড়ি ভেঙে ঘুম থেকে ওঠা। হুলো বেড়ালের সঙ্গে মারামারি করা। রানির অভ্যাস।

চম্পা দু'হাত তুলে বলে, থাম, থাম। তাহলে কি হুলো বেড়াল রাজা? ওদেরতো বিয়ে হয় না।

তাইতো, তাইতো।

দু'জনে একসঙ্গে তাইতো তাইতো বলতে থাকলে রান্নাঘরের দরজার কাছে শুয়ে থাকা বেড়ালটা আড়িমুড়ি ভাঙে। ওদের দিকে তাকায়। চারদিক দেখে। তারপর মিউ মিউ করে শব্দ করে।

দুই বোন আবার থমকে যায়। বেড়ালের দিকে তাকিয়ে চম্পা বলে, বেটি কেমন আয়েশ করে আড়িমুড়ি ভাঙল।

রানিরা বোধহয় এমন আয়েশে আড়িমুড়ি ভাঙে।

আমাদের হাস্নাবুর আয়েশ ভাঙা হবে না।

কেন?

গার্মেন্টের কর্মীদের ঘাড়ের ওপর বোঝা। টানতে টানতে দিন ফুরোয়। আড়িমুড়ি ভাঙবে কখন? ঘুম থেকে উঠে লাফ দিয়ে ছুটতে হবে। হাস্নাবু ছোটাছুটির রানি হবে। নিজের ভাত নিজে খাইবে।

হ্মাহ্মাহ্মা

দু'বোন হাসতে থাকে। হাসতেই থাকে। হাসতে হাসতে দু'বোনের ঘোর ভাঙে। চম্পা আস্তে করে বলে, আচ্ছা পদ্ম আমাদের শিউলিবুর কি রানির ভাগ্য?

হ্যাঁ, শিউলিবুবুতো রানিই।

কেমন রানি? তার তো রাজা নাই।

শিউলিবু নিজেই নিজের রাজা। তার রাজা লাগে না।

হ্মাহ্মাহ্মা

দুই বোন আবার হাসে। দুই বোন সকালেই ঠিক করে রেখেছিল যে তারা আজ হাসি দিয়ে বাড়ি মাতিয়ে রাখবে। আরেক বোন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে এমন সানাইয়ের সুর বাজবে না। আজ ওদের স্কুল বন্ধ। শিউলি জরুরি কাজে স্কুলে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে। জয়নুল মিয়াও বাড়িতে নেই। কোথায় গিয়েছে ওরা জানে না। ওরা শুধু জানে, মেয়েটা এই বাড়ি থেকে বিদায় হবে না এই দুঃখ আছে তার মনে। জামাই একরাতও এই বাড়িতে থাকেনি এই দুঃখও আছে তার মনে। একসময় খিহি ক রে হাসতে হাসতে চম্পা বলে, আমাগো বাজানের ঘাড়েও দুঃখের বোঝা।

বাজানতো দুঃখের বোঝা টানতে টানতে বুড়া হইল।

চম্পা কথা বলে না। হাসিও নেই। শুধু চড়ুইয়েরশালি কের কিচকিচ শব্দ বাড়ি মাতিয়ে রাখে। দু'জনে কান পেতে শুনে বলে, ওরাই আমাদের হাসি। আমরা হাসতে না পারলে কি হবে ওদের হাসি আছে।

যেন দু'বোন হাসতে না পারার অক্ষমতা ঢাকতে চাইছে। ওদের চোখে পানি আসে। আজ ওদের তিন নম্বর বোন ঢাকায় যাবে। ঈদে চাঁদে বাড়িতে আসবে। অথচ এ বাড়িতে হাস্নুহেনাকে ঢাকায় বিদায় দেওয়ার আনন্দ নেই। শূন্য বাড়ির কাঁঠাল গাছের মাথায় বসে কাক ডাকে। শালিক আছে। একঝাঁড় চড়ুই উঠোনের কোনায় লাফালাফি করে। দু'বোন পা ঝুলিয়ে বারান্দায় বসে থাকে। শিউলি বলে গেছে রাঁধতে হবে না। হাঁড়িতে পান্তা আছে। মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে খাবে। রাঁধতে ইচ্ছে না করলে ওরা এভাবেই খাওয়ার পর্ব শেষ করে। অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকার পরে পদ্ম চম্পার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। বলে, চম্পাবু।

চম্পা ওর দিকে না তাকিয়ে বলে, কি বলবি বল। বাজে প্যাঁচাল পাড়বি না কিন্তু।

তোমার কথা। তোমার গল্প।

বল না, শয়তান কি বলবি বল।

তুমি বিয়া করবা না চম্পাবু?

করব না কেন, একশোবার করব। চম্পা কণ্ঠে জোর ফুটিয়ে তোলে। আমি এমন পোলা চাই যে ঘরজামাই হইব। বাজানরে একা থুইয়া আমি কোনখানে থাকুম না। আমার কোন শ্বশুরবাড়ি থাকব না।

হ্মাহ্মাহ্মা। প দ্ম একা একাই হাসে। ওর হাসিতে উড়ে যায় কাক। ও হাসতে হাসতে বলে, এমুন পোলা কই পাইবা?

না পাইলে বিয়া করম্নম না। চম্পা এক ধরনের উদাসীনতায় নিজের চারদিক ভরিয়ে রাখে। পদ্ম খানিকটা সরে বসে। হঠাৎ ওর ভয় করে। দ্রম্নত কণ্ঠে বলে, না, তুমি আমাগো চোখের সামনে শিউলিবু হইতে পারবা না।

তাইলে একটা এতিম পোলা খুঁইজা বাইর করবি।

যদি জাউরা পোলা হয়?

তাও বিয়া করমু। জাউরা পোলা হইলে তো বাঁইচা গেলাম। বাপ্প মায়ের হদিস থাকব না।

আইচ্ছা, তাই সই। বাজানরে কমু তোমার লাইগা গরুর রাখাল খুঁজতে। ও গরু চরাইব। তুমি গোবর কুড়াইবা। তারপর ঘুঁটে বানাইবা। তোমার রাখাল ঘুঁটে লইয়া বাজারে বেচতে যাইব।

তুইতো খুব সুন্দর গল্প বানালি রে পদ্ম।

তোমারে আমরা ঘুঁটে বানানো রানি ডাকুম। আর তোমার জামাই হইব রাখাল রাজা।

সত্যি রে পদ্ম?

সত্যি না তো মিথ্যা নাকি!

আবার হ্মাহ্মাহ্মা হাসি তে দু'জনে বাড়ির আঙিনা তোলপাড় করে। যেন প্রবল বেগে বাতাস উড়ে যাচ্ছে– কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে তার কোন হদিস নেই। তখন পর্যন্ত দুপুর গড়ায়নি। সূর্য মধ্য গগনে নয়। তখন ওরা দেখতে পায় বাঁশের ঝাঁপ খুলে উঠোনে ঢুকছে হাস্নুহেনা। লাল টুকটুকে শাড়ি পরেছে সঙ্গে ফুলপাতা নকশা আঁকা বস্নাউজ। দু'হাতে কাচের চুড়ি। হাত্নভর্তি মেহেদির রঙের নকশা আঁকা। পায়ে আলতা। হঠাৎ করে ওদের কাছে হাস্নুহেনাকে খুব অপরিচিত মনে হয়। যেন নতুন কোন মেয়ে এই বাসায় ঢুকছে। এখন ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তুমি কোথা থেকে এসেছ? কার সঙ্গে দেখা করবে? হাস্নুহেনা উঠোনের মাঝ বরাবর এসে স্তব্ধ হয় বসে থাকা দুইবোনের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবে, ওরা এভাবে বসে আছে কেন? ওদের কি হয়েছে? ওদের মাঝে দূরত্ব সামান্য। কথা বললেই শোনা যাবে। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। হাস্নুহেনার সঙ্গে বাবলার বোনের দুই ছেলেমেয়ে এসেছে। ওরা দু'জনে হাস্নুহেনার দুই হাত ধরে রেখেছে। ওরা দু'জনে একসঙ্গে বলে, মামি চল না। বারান্দায় গিয়ে বসি।

হ্যাঁ, চল।

হাস্নুহেনা বারান্দার কাছে এসে দু'বোনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, তোদের কি হয়েছে?

চম্পা বলে, আমরা তোমাকে দেখছি। তোমাকে রানির মত লাগছে।

রানির মত?

হ্যাঁ, তাইতো। বাড়িটাকে রাজার বাড়ি লাগছে। রাজার মেয়ে কাজ করতে বিদেশে যায়।

সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে যায়? হাস্নুহেনার কণ্ঠস্বর খুব বিষণ্ন শোনায়। চুপ করে থাকে চম্পা আর পদ্ম।

কথা বলছিস না যে?

আমরা জানি না।

ময়ূরপঙ্খি নায়ে যায়?

আমরা জানি না।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে হাসনুহেনা। কান্নার শব্দে চমক ভাঙে দু'বোনের। বারান্দা থেকে নেমে হাসনুহেনার হাত ধরে। টেনে এনে বারান্দায় বসায়। হাসনুহেনা দু'হাতে চোখ মোছে।

কাঁদলে কেন? আমাদের ছেড়ে যাবে সেজন্য?

না। তোরা আমাকে রানি বলেছিস সেজন্য। আমি তো ঘুঁটেকুড়ানি মেয়ে। আমি রানি হব কেন? আমি রানি হতে চাই না।

তুমি তোমার সংসারের রানি হবে।

মিথ্যে কথা।

বাবলা ভাইতো তোমাকে ভালবাসে হাসনুবু।

ভালবাসা শব্দটি হাতুড়ি পেটার মত শব্দে প্রবেশ করে হাসনুহেনার কানে। ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকায় ও। বুঝতে পারে ছোট দুইবোন ওর দিকে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে। ওর বুক ফেটে যায়। গলার কাছের দম আটকানো পাথর ঠেলে কথা বের হয় না।

কথা বলছ না কেন বুবু?

ভাল লাগছে না।

মায়ের কাছে তোমরা ভাল ছিলে না?

জানি না।

মা আদর করেনি।

করবে না কেন, একশোবার করেছে। মা কি আমাদের পর?

তাহলে দুলাভাই আদর করেনি?

হানুহেনা চিৎকার করে বলে, এতকথা আমাকে জিজ্ঞেস করবি না। জিজ্ঞেস করলে তোদের জবাই করে ফেলব।

কি হয়েছে তোমার?

আজ আমি সন্ধ্যায় ঢাকায় যাব। আর এই বাড়িতে রান্না নেই কেন বল?

দুলাভাই আসবে না এজন্য।

কেন আসবে না?

আমরা কি করে জানব?

এটাই একটা গ-গোল। গ-গোলটা আমিও বুঝি না।

তাহলে কে বোঝে?

শিউলি আর বাবলা।

চম্পা আর পদ্ম বিস্ময়ে চমকে ওঠে। আতঙ্কে চোখ বড় করে।

বিড়বিড় করে বলে, শিউলি আর বাবলা। কত সময় পেরিয়ে যায় ওরা বুঝতে পারে না। কোথায় কেন কি জমে আছে সেটা ওরা ধরতে পারছে না। শুধু হাসনুহেনার আলতা রাঙা পা কিংবা মেহেদির নকশা করা হাত দেখে জানে হাসনুহেনা এতদিনের চেনা বোনটি নয়। ওর অনেকখানি জায়গা ওর একার হয়ে গেছে। ওখানে ওরা পা ফেলতে পারবে না। ওখানকার ঘাস পুড়বে– খরা থাকবে আর পোড়ামাটির রঙ কালো হতেই থাকবে– হতেই থাকবে। তখন কি করবে হাসনুহেনা? নিজের ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দেবে? শিউরে ওঠে দু'বোন। দু'বোনের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু কেউই হাত দিয়ে চোখ মোছে না। শিউলি কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, কি হয়েছে তোদের?

কেউ একজন বলে, মন খারাপ।

কেন? শিউলি ভুরু কুঁচকায়।

তোমার জন্য আমরা বসে আছি।

কেন?

তুমি বাড়িতে এলে তো আমরা শুকনো মরিচ পোড়াব।

কতগুলো পোড়াবি?

তুমি যতগুলো চাও ততগুলো।

আমি হাজার হাজার চাই। তারপর?

এবার হাসনুহেনা মুখ খোলে। চোখ বাঁকিয়ে বলে, মরিচ পোড়া গন্ধে বাতাসে আগুন ধরবে। সেই আগুনে দাউদাউ পুড়বে হাসনুহেনা। ওর পোড়া শরীর থেকে মরিচ পোড়ার ঝাঁঝ আসবে। পোড়া শরীরে কোন গন্ধ থাকবে না। চামড়া পোড়ার গন্ধ।

শিউলির হাতে একগাদা কাগজপত্র আর ছাতা। ও দেখতে পায় কথাটুকু বলে, হাসনুহেনা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। ও আতঙ্কিত হয়। কি হয়েছে ওর। চম্পা বলে, তুমি কি ভাত খাবে বুবু?

হ্যাঁ, খিদে পেয়েছে।

মরিচ পোড়াই আর পেঁয়াজ কাটি?

রান্নাঘরে যা। আমি আসছি। ওই ময়না পাখিরা তোরা কি খাবি?

দুই বাচ্চা হেসে বলে, আপনেরা যা খাবেন তাই।

শিউলি দু'জনের মাথায় হাত রেখে বলে, পান্তা ভাত আর মরিচ পোড়া।

ওরা চেঁচিয়ে বলে, খাব খাব।

মরিচ পোড়ার গন্ধে কাশবি না তো?

হাসনুহেনা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, কাশবে। কাশতে কাশতে পরানটা গলার কাছে এনে ঠেকাবে।

ওর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে থমকে যায় শিউলি। ওর দিকে এক ঝলক তাকায় মাত্র। কোন কথা বলে না। বুকের ভেতরে গুড়গুড় ধ্বনি শুনতে পায়। বাবলা কি কিছু বলেছে হাসনুকে? এমন রেগে আছে কেন? তবে এটা ঠিক হাসনুহেনার জন্য এ বাড়িতে আজ কোন আয়োজন নাই। ওকে বিদায়ের আয়োজন তো থাকা উচিত ছিল? বিষয়টি শিউলি ইচ্ছা করলেই উল্টে দিতে পারত। দেয়নি। শিউলির ভাল লাগেনি। ইচ্ছেও হয়নি। ও বাচ্চা দুটোর হাত ধরে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখতে পায় চম্পা আর পদ্ম থালায় পান্তা সাজাচ্ছে। বাচ্চা দুটো খুকখুক করে কাশে। শিউলি ওদের নিয়ে টিউবওয়েলের কাছে আসে। বাচ্চাদের হাতমুখ ধুইয়ে দেয়। বলে, আপনাকে আমরা কি ডাকব? মামী?

না খালা ডাকবি।

মামীর বোন মামী হয় না?

না, হয় না। ওই যে গামছা ঝুলছে, যা মুখ মুছে নে। তারপর আমরা ধুমসে পান্তা খাব। বাড়িতে গিয়ে তোদের মা যখন জিজ্ঞেস করবে, তোরা কি খেয়েছিস? বল তো, কি বলবি?

একজন খিহি ক রে হাসতে হাসতে বলে, মাকে বলব যে পোলাও কোর্মা খেয়েছি।

কেন মিছে কথা বলবি?

বা রে মামীর বাপের বাড়িতে এসে কি পান্তা ভাত খাওয়ার কথা বলা যায়?

আর একজন বলে, এটা শুনলে মায়ের মন খুব খারাপ হবে। নানিও

মন খারাপ করবে। মামাও করবে।

তোরা তো খুব বুঝের পোলাপান রে! মাগো এত কিছু ভাবতে পারিস!

দু'জনে খিহি ক রে হাসতে হাসতে বলে, আমরা অনেককিছু জানি।

তাই। অনেককিছু জানিস। শিউলির খুব মন খারাপ হয়। দেখতে পায় বাচ্চাদুটো উঠোনের দিকে ছুটছে। ওরা ওর সামনে থেকে আড়াল হয়ে গেলেও ও সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। প্রবল শূন্যতা ওকে আচ্ছন্ন করে। বাবলার সঙ্গে হাসুহেনার বিয়ের আগে ওর ভেতরে এক ধরনের ঘোর ছিল। এখন ও আর ঘোরের মধ্যে নেই। এখন ও পুড়ছে। বিয়েটা মানতে না পারার জ্বলুনি। নিজেকে অজস্রবার প্রশ্ন করছে। কিন্তু নিজের কাছ থেকে কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। বরং কষ্টের যন্ত্রণায় নিজেকে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

ও জোরে জোরেই বলতে থাকে, হাসু আজ ঢাকায় যাবে। নাচবে গাইবে এবং মরবে। বারবার বলার সময় সুর করে টেনে টেনে বলে। একদিন খবর আসবে হাসু নাই। হাহাহা হাসি তে মেতে উঠে ও বালতিতে জমিয়ে রাখা পানি দু'হাতে ছড়ায়। নিজের মুখ ধোয়। দু'হাতে চেপে রাখে চোখ। বুঝতে পারে চোখে পানি নেই। পোড়াকয়লার আঁচ আছে। সে আঁচে পানি লাগে না। জ্বলুনি ছাড়া ওখানে আর কিছুই নেই। শিউলি শ্লথ পায়ে রান্নাঘরে আসে।

পান্তাভাত খাওয়া শেষ হলে শিউলি আড়চোখে হাসুহেনার দিকে তাকায়। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি তাকিয়ে বলে, তোর গোছগাছ শেষ হয়েছে হাসু?

হয়েছে। আমার কিছু করতে হয়নি। ননদরা ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছে। শাশুড়ি পিঠে পুলি বানিয়ে পোটলা বেঁধেছে। খইমুড়ি দিয়েছে। নারকেলের নাড়ু বানিয়েছে। রাতের জন্য গরুর গোস্ত আর খিচুড়ি রেধেছে। দুপুর গড়ানোর আগে বলেছে, যাও বোনদের সঙ্গে পোলাও কোর্মা খেয়ে আস। আমি চলে এসেছি। জানতাম নাতো যে এ বাড়িতে আজ রান্না হবে না।

চম্পা বলে, হাসুবু তুমি ঢাকায় গিয়ে কতকিছু খাবে। স্লেসব খাবার আমরা চোখেও দেখিনি। আজ দুপুরে যত মজা করে পান্তা খেয়েছি এমন মজা করে আর একদিনও খাইনি। পান্তা খাওয়ার কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। তোমাকে বিদায়ের দিনে পান্তা দিয়ে উৎসব।

হাসুহেনা চোখ বড় করে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, কচু। আমাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এ বাড়িতে আজ রান্না নেই।

পদ্ম চেঁচিয়ে বলে, মিথ্যে কথা। এ বাড়িতে তোমার বর আসেনি স্লেজন ্য রান্না হয়নি।

শিউলি ধমক দিয়ে বল, চুপ কর পদ্ম।

হাসুহেনা কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আমার বর বিদায় নিতে বিকালে আসবে। দষ্টমি ষ্টি কিনতে বাজারে গেছে।

হুররে দষ্টমি ষ্টি! কি মজা! কি মজা! আজকে বাজানষ্টবা কেন বাড়িতে আসেনি! বাজানরে আমরা কোনহানে খুঁজতে যামু।

হাসুহেনা তিক্ত হাসি হেসে বলে, বাজান পলাইছে। শিউলিবুর স্কুলের কাম পড়ছে। আর আমার কপাল ভাঙছে। ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগবে না। এই বাড়ি থেকে ভাঙা কপাল নিয়ে বিদায় হব আমি।

আকস্মিকভাবে নীরবতা নামে ওদের মাঝে। কেউ কারো দিকে তাকায় না। একেকজন একেক দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে চার কোনের ভাবনা একই সমান্তরাল যায় না। যে যার মত একটি বিদায়ের দিন বোঝার চেষ্টা করে। ছোট বাচ্চাদুটো দৌড়াদৌড়ি করছে। কতক্ষণ উঠোনে থাকে, একটু পরে বাইরে যায়। একসময় চার বোন খেয়াল করে বাচ্চাদুটো একজন ডাকপিয়নের হাত ধরে বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটি চিৎকার করে বলে, মামি আপনাদের বাড়িতে টাকা এনেছে এই মামা।

চারজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, কে পাঠাল টাকা?

পদ্ম লাফাতে লাফাতে বলে, নিশ্চয় বকুল বুবু পাঠিয়েছে। বকুলবুবু ছাড়া কে আর টাকা পাঠাবে?

চারবোন দ্রুতপায়ে ডাকপিয়নের কাছে যায়। ডাকপিয়ন হাসিমুখে বলে, সৌদি থেকে টাকা এসেছে। আমাকে বকশিস দিতে হবে কিন্তু।

কতটাকা? পিয়ন ভাই কত টাকা?

পঞ্চাশ হাজার।

পঞ্চাশ হাজার। ও আল্লাহ মাবুদ! শিউলি দু'হাত উপরে তোলে।

হাসুহেনা বিষণ্ন মুখে বলে, আমি জীবনেও পঞ্চাশ হাজার টাকা চোখে দেখব না।

আপনাদের বাজান কই? তাকে ডাকেন। টাকা তো তার নামে এসেছে। তার সই লাগবে।

শিউলি বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, বাজানতো বাড়িতে নাই।

তাহলে তো টাকা দেওয়া যাবে না।

হাসুহেনা এগিয়ে গিয়ে বলে, আপনাকে মোড়া দেই, আপনি গাছতলায় বসেন। বাজান এসে পড়বে বলে। আজ আমি ঢাকায় চলে যাব তো তাই বাজানের মনে খুব দুঃখ।

আহা, তাই নাকি? দাও, মোড়া দাও। বসে একটু জিরিয়ে নেই। পানিও দিও। বড্ড তিয়াস পেয়েছে।

বাজান এখনি এসে পড়বে। আপনার বেশিক্ষণ বসতে হবে না। আমি ঢাকায় যাব আর বাজান বাড়িতে থাকবে না তা কি হয়!

ঠিকই বলেছ। আমার মেয়ে ঢাকায় গেলে আমারও এমন লাগত। আল্লাহ মাবুদ।

হাসুহেনার কথায় তিন বোন অবাক হয়। অবাক হয়েই দৌড়ে ঘরে যায় চম্পা। নারকেলের নাড়ু আর পানি নিয়ে আসে মোড়ার ওপর রেখে। বাড়িতে টাকা এসেছে– বাড়িতে দালান উঠবে। আমাগো বাজান সোনার পালঙ্কে ঘুমাইবে। বাজান গো তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসেন!

চার বোন ডাকপিয়নের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নাড়ু খাওয়া দেখে। মুখে তৃপ্তির ঝলক দেখে। একটানে গ্লাসের পানি শেষ হতে দেখে। এমন একটি দৃশ্য এই জীবনে দেখা হবে তা ভাবতে পারে না শিউলি। শিউলির মাথায় বনবন করে ঘোরে হাসুহেনার ঢাকায় যাওয়ার কথা। ও ঢাকায় যাবে বলে বাজানের দুঃখের কথা। ওরা কেউইতো জানে না যে ওদের বাজান কোথায়? কখনষ্টবা আস বে? ও শুনতে পায় ডাকপিয়ন মোড়ায় বসে গুনগুন করে গান গাইছে। মনপাখি মোর উইড়া গেল বনের গহীনে– । লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কাঁধ পযন্ত ঝোলান। গানের সুরে মাথা নাড়ালে চুলগুলো এলেমেলো হয়ে যায়। লোকটি চোখ বুঁজে আছে। ওরা চারবোন বাড়ির উঠোনে যায়। গোল হয়ে দাঁড়ালে হাসুহেনা বলে, আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় থাকি। উনি যদি চইলা যায় সেটা খেয়াল রাখা দরকার। এই বাড়িতে টাকা আসছে আমি এইটা দেইখা যাইতে চাই।

শিউলির হাত ধরে চম্পা বলে, ঠিক কথা। চল সবাই বাইরে যাই।

পদ্ম বলে, বাজান কি এত টাকা গুনতে পারবে?

পারবে। পারবে।

বাজান তো এত টাকা চোখে দেখে নাই।

খিহি ক রে হাসে পদ্ম। হাসতে হাসতে বলে, বাজানের মেয়ে বাজানরে টাকা দেহাইল। আহারে আমাগো সোনার মা আইজ ঘরে নাই।

কারো মুখে কথা নাই। নিস্তব্ধতা নামে বাড়িতে। গানের গুনগুন ধ্বনিও নেই। বাচ্চাদুটো দৌড়তে দৌড়তে অনেকদূরে চলে গেছে। চারবোনই একসঙ্গে ভাবে, আজ এ বাড়িতে মা নেই। দুখিনী মায়ের দুঃখের শেষ নাই। এই জনমে তার আর সুখ পাওয়া হবে না। তখন হাসুহেনাই প্রথম খেয়াল করে যে বাবলা আসছে। হাতে দইয়ের হাঁড়ি আর মিষ্টির ঠোঙা। চম্পাও খেয়াল করে। জোরে জোরে বলে, হাসুবু দেখ কে আসছে?

দেখেছি। সবার আগে দেখেছি।

শিউলি বলতে পারে না যে আমিও দেখেছি। ওকে তো প্রথমে আমারই দেখার কথা। তোরা শুধু শুধু দেখার কথা বলিস। শিউলির বুকের ভেতর আনন্দের জোয়ার। দেখতে পায় মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে বলে চারদিকে নরম আলো চিকচিক করছে। যতদূর চোখ যায় তার সবটুকু সৌন্দর্য ওর দুচোখে ভর করে। এই মুহূর্তে নিজেকে একজন পূর্ণ মানুষ মনে হয় শিউলির। ও মুখজুড়ে ছড়িয়ে রাখে হাসি। হাসুহেনা চম্পা আর পদ্ম রাস্তার দিকে এগিয়ে গেছে।

ডাকপিয়ন শিউলির দিকে ঘুরে বলে, আমি যাই। আর কতক্ষণ বসে থাকব। কালকে আসব। আপনার আব্বাকে বাড়িতে থাকতে

বলবেন।

আর একটু বসেন। ওই যে বাবলা আসছে। দইমিষ্টি আছে ওর কাছে। আপনি খাবেন।

দইমিষ্টি। আহা, কতদিন খাইনি।

আমাদের বাড়িতে কোনদিন ডাকপিয়ন আসেনি। আপনিই প্রথম।

আহারে জয়নুল মিয়ার ছেলে নাই?

নাই। শিউলির গলা শুকিয়ে যায়।

ছেলে থাকলে কামাই করে বাপেরে টাকা পাঠাত। অভাগা মানুষ।

আমার বাজানতো সই করতে পারে না। তার তো টিপসই দিতে হবে।

টিপসই? টিপসই দেওয়ার ব্যবস্থাতো আমার কাছে নাই।

তাহলে? শিউলি চিন্তিত হয়। তখন হইচই করতে করতে সবাই কাছে এসে দাঁড়ায়। বাবলা বলে, এটা আমার শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর বাড়িতে নাই তো কি হয়েছে। সই দিয়ে টাকা নেওয়ার লোক আছে এই বাড়িতে। আপনি আগে দইমিষ্টি খান। তারপর টাকা দিয়ে বাড়ি যান। হাসু ওনার জন্য দইমিষ্টি আন।

তিন বোন চলে গেলে শিউলি হাততালি দিয়ে বলে, এই বাড়ির মেয়ে আজকে ঢাকায় যাবে। এই বাড়িতে টাকা এসেছে। এই বাড়ির মেয়ে দুবাইয়ে থেকে আয় করে। এই বাড়িতে কত শান্তি।

বাবলা চমকে শিউলির দিকে তাকায়। বলে, তোমার মনেও শান্তি?

অনেক শান্তি! শান্তির পুকুর আছে আমার মনে।

হাহা করে হাসে বাবলা। হাসতে হাসতে বলে, আজ আমি তোমার হাতে টাকা তুলে দেব শিউলি। টাকা পাওয়ার আনন্দ তোমার মনে থাকুক।

দইমিষ্টি নিয়ে আসে হাসুহেনা। পদ্মর হাতে পানির গ্লাস। ডাকপিয়নের খাওয়া শেষ হলে বাবলা বলে, ভাইজান আপনি টাকাটা ওনার হাতে দিয়ে যান। উনি এই বাড়ির মালিক।

মালিক। ডাকপিয়ন বিস্ময়ে চোখ বড় করে।

হ্যাঁ, উনি যা বলেন তাই এই বাড়িতে হয়। সইটাও উনি করবেন। টাকাটা উনিই গুনে নিবেন। আপনি ঝোলা খোলেন। আমি আপনাকে বখশিস দেব।

ডাকপিয়ন ঝোলা খোলে। শিউলির মনে হয় বাবলা আর একবার প্রতিশোধ নিল। বাবলা শেষ দেখে ছাড়বে। ডাকপিয়ন ওর দিকে কাগজ এগিয়ে দিলে ও মাথা নিচু করে সাইন করে। বুঝতে পারে বুকের ভেতর ফুঁসছে। ওখানে এখন আগুন।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক

চট্টগ্রামে নবনির্মিত সুবিমল দত্ত ভবনের উদ্বোধন

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম হাই কমিশনার সুবিমল দত্তর জন্ম চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কানুনগোপাড়ায়। তাঁর পরিবার ছিল চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংস্কৃতিবান, সমৃদ্ধ ও সর্বমহলে সম্মানিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চট্টগ্রাম শিক্ষাদী ক্ষা ও জাতীয়তাবাদের উত্থানে অনেক এগিয়ে ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক প্রসার এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী তরুণ প্রজন্ম ও আলোকিত মানুষের জন্ম দিয়েছিল– এঁরাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

দত্তপরিবার চ ট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেকগুলি শিড়্গা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯০২ সালে এঁরা *বান্ধব পাঠাগার* নামে একটি পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠাগারটির অসংখ্য বই এবং শিক্ষাউপকরণ চ ট্টগ্রাম অঞ্চলের পণ্ডিতদের প্রভূত সাহায্য করে। ড. কালীচরণ কানুনগো, ড. বিভূতিভূষণ দত্ত, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ব্যক্তিবর্গ এ পাঠাগার থেকে উপকৃত হয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সূর্য সেন এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা এ পাঠাগারটি নানাভাবে ব্যবহার এবং এখানে অনেক গোপন সভা করেছেন। ১৯৭১ সালে পাঠাগারটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনির বেপরোয়া লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাঠাগারটি পুনর্নির্মিত হয়। ভারত সরকারের সহায়তায় বর্তমান নতুন ভবনটি পুনর্নির্মিত হল।

১ ডিসেম্বর ২০১৪ বান্ধব পাঠাগারের নবনির্মিত 'সুবিমল দত্ত ভবন'এর উ দ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মঈনউদ্দিন খান বাদল এমপি, চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতের সহকারি হাই কমিশনার সোমনাথ হালদার, বোয়ালখালী উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আতাউল হক প্রমুখ।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

ছোটগল্প

জাদুঘর

রবিউল হুসাইন

ইদানিং ও প্রায় ঘটনায় অসম্মানিত আর অযাচিতভাবে অপমানজনক পরিস্থিতিতে পতিত হচ্ছে। এটা কেন যে হচ্ছে বুঝতে পারছে না। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় অমন অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে কেন এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটছে। ও ভেবে ভেবে কোন কিছুর কারণ খুঁজে পায় না। ও চিন্তা করে, সবকিছুই যে কারণ-সম্মত হয়ে থাকে এমন কোন কথা নেই। তাহলে ঘটনাটি কী? এর কিছুই বোধগম্য নয়। তখন মনে হয়, আচ্ছা সবকিছুই বুঝতে হবে, এই অদ্ভুত মনোবৃত্তি কেন? সবকিছুই যে জানতে হবে, এই চেষ্টা করাটা তো একটা মানসিক অস্বাভাবিকতার পর্যায়ভুক্ত। ও চিন্তিত হয়ে পড়ে, তাহলে সে কী কোন মনোবিকারের মধ্যে কালাতিপাত করছে, না কী এই প্রক্রিয়াটি হীনমন্যতাপ্রসূত উচ্চ মনোলোকজাত এক অবহেলিত বিপরীতমুখী অনুভূতি? ওর বোধ জাগে, এভাবেই রহস্যময়তার জন্ম হয়। যখন কোন কিছুর সমাধান সামনে পাওয়া যায় না, তখন এমন হয়ে থাকে। সব প্রশ্ন জমে জমে যে পাহাড় তৈরি হয়, সেখানে কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেটাই শেষ পর্যন্ত এক গভীর রহস্য– হৃদয়ের পাড়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

হৃদয় একটা হ্রদ কিংবা সমুদ্র। আর সমুদ্র হচ্ছে একটি অনাবিষ্কৃত জাদুঘর, হৃদয়ের জাদুঘর। যেখানে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের যাবতীয় প্রদর্শিতব্য সব স্বপ্ন-আশা, সুখ-দুঃখের

> হাঁটতে হাঁটতে রাতের ঢাকা শহর দেখা শুরু করে। ধানমন্ডির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে সুখের সংসার, শান্তি আর সম্পদের ঠিকানা এবং তা বয়ে যাচ্ছে সুখী এক নদীর মত। ওরা কত তৃপ্তি নিয়ে বেঁচে-বর্তে আছে। ওদের চোখে-মুখে স্বপ্ন আর ভালবাসার উজ্জ্বলতা– সব চারিদিকে উদ্ভাসিত হয়ে বিস্তার লাভ করেছে। সেই উজ্জ্বলতায় অবগাহিত হতে হতে ও একটু হেসে ওঠে, কিন্তু কোন আনন্দ পায় না এবং এতে ও বুঝল হাসি পেলেই সুখী হওয়া যায় না। সুখ এমন একটা দুর্লভ বস্তু, হাসির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, যেমন কান্নার সঙ্গে দুঃখের।

উপাদানসামগ্রী বিদ্যমান। কিন্তু কোনদিন সেগুলো দেখা যাবে না, তাই সেটি একটি রহস্যময় জাদুঘর হিসেবে চিরকাল মনের মধ্যে বিরাজ করবে, কোনদিন উদ্বোধিত হবে না। ভেতরে কী ধন-সম্পদ গচ্ছিত আছে, কোনদিন জানা যাবে না, কোনদিন প্রকাশ পাবে না, কোনদিন আলোর মুখ দেখবে না। এমন নয় যে সে দেখতে অনাকর্ষণীয় বা হতশ্রী। তবুও তার বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটে না কোনভাবে কেন ও তা জানে না। এমনই সেই ঘটনাবহুল জীবনের জাদুঘর। আর সেই সব কেন্দ্র করে যাবতীয় সমাধানহীন রহস্যময় ঘটনার পুনঃপরিক্রমী যাত্রা।

দুই.

সেদিন রাস্তার ধারে উদ্দেশ্যহীনভাবে মানুষজন, রিক্সা, গাড়ি, বাস, ট্রাক দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল। কথায় বলে না, বিধাতা মাথার সামনে দুটো চোখ প্রদান করে বিনা পয়সায় আমাদের সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছেন। সে তাই অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ সামনে ব্যাগ কাঁধে, ওর পাড়ার মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আরে তুমি কেমন আছ?

আপনি ভাল তো? খালাম্মা কেমন আছেন?

ভাল, সব ভাল। খুব ভিড়।

ভাইয়া আমার হলে আসেন একদিন ছুটির দিনে। ওই যে ওই হল। নিউ মার্কেটের কাছে আর্ট কলেজের যে হোস্টেল, তার পাশেই আমার হল।

ও বলে ঠিক আছে যাব একদিন। মধু কেমন আছে।

হ্যাঁ, ভালই আছে। মধু মেয়েটির প্রেমিক। সে-ও তার ক্লাসে পড়ে, ক্লাস-মেট। সবাই জানে ওদের প্রেমের ঘটনা।

তো একদিন ও ছুটির দিনে কি মনে করে মেয়েটির হলে গিয়ে হাজির। বেশ খানিক সময় ধরে ওয়েটিং রুমে অনেকের সঙ্গে বসে ছিল। দেখে মধুও বসে আছে। ও ভাবে চলে গেলেই ভাল। আর ঠিক সেই সময়ে চুল গোছগাছ করতে করতে মেয়েটি রুমে ঢুকে চলে আসে সামনে।

আরে আপনি!

বললাম, ওই যে তুমি বলেছিলেন ছুটির দিনে চলে আসতে। তাই এসেছি।

ওহ্ রে খোদা, সেটা তো আমি এমনি এমনি বলেছিলাম। তাতেই চলে এসেছেন।

মধু হাঁ করে আমাদের কথা শুনছিল। আমি লজ্জায় আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক আছে আমি যাই, তোমরা গল্প কর। আবার দেখা হবে, বলে হন্ হন্ করে চলে এসে ও রাস্তায় নামে। কী যে বিব্রতকর অবস্থা! ও নিজেকে খুব গালাগাল দেয়। লজ্জা করে না তোমার! সে ওভাবে কথার কথা একটা বলল, আর অমনি ইডিয়টের মত চলে এলে! যেখানে তুমি ভাল করেই জানো মেয়েটি আর মধু বহুদিন ধরে একে অপরকে ভালবাসে। এসব জেনেও তুমি কেমন করে চলে গেলে! তুমি কোনদিন মানুষ হবে না, নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। নিজেকে নিজে গাল দিয়ে আপনমনে হেঁটে হেঁটে পথের বুক চিরে চিরে এগোয়, কোথায় যায়, জানে না। জানে শুধু এইটুকু যে মনে মনে ও খুব অপমানিত বোধ করেছে, খামাখা। দুঃখ লাগে কেন যে সেখানে গিয়েছিল, তবে কী মেয়েটির সঙ্গে সব জানা সত্ত্বেও একটু ভাব জমাতে! ছি, ছি, ও নিজেকে ধিক্কার দেয়। সত্যিই সে খুব নীচু মনের একটা আস্ত উজবুক। নিজেকে এইভাবে আর যে কত অপমানিত করবে! আরও দিন তো পড়েই আছে। ও নিজেকে জিজ্ঞেস করে, সারা জীবন তার এরকমই চলবে কি! আর কতবার কতভাবে নিজেকে অপমানিত করবে।

তিন.

কিছুদিন আগে পরপর কয়েকটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। ওর এক ভাই অনেকের সঙ্গে ওকে রাতে তার বাসায় খাবারের জন্যে দাওয়াত দিয়েছে ছুটির দিন। ফাঁকা রাস্তা। ও একটা রিক্সা করে ভাইয়ের বাসার গেটে হাজির। তার আগে ফোন করে জেনে নিয়েছে সঠিক ঠিকানাটা। বাসার সামনে রিক্সা থেকে নামার কারণে তাকে হয়তো দারোয়ান তেমন গুরুত্ব না দিয়ে ঢোকার মুখে গেটের পালা ধরে জিজ্ঞেস করতে থাকে, কোথায় যাবেন, ফোন করেন, খাতায় সই করেন, কার কাছে যাবেন ইত্যাদি।

ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। যাঃ তাহলে যাবই না, বলে সে ফেরৎ আসে এবং ভাইকে জানায় যে, গেটে দারোয়ানের কোন কারণে কিছু সন্দেহ হওয়াতে তাকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এবং ঢুকতে দেয় না বলে সে চলে যাচ্ছে।

ওর ভাই বলে, এর কোন অর্থ হয়, তুমি উচ্চ কিংবা হীনমন্যতায় ভুগছ, ডাক্তার দেখাও! কাউকে কিছু বলল না শুধু তোমাকেই বলল। আশ্চর্য! আস তো, পাগলামি কোরো না। আমি দারোয়ানকে বলে দিচ্ছি।

ও কিছু বলে না। হাঁটতে হাঁটতে রাতের ঢাকা শহর দেখা শুরু করে। ধানমন্ডির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে সুখের সংসার, শান্তি আর সম্পদের ঠিকানা এবং তা বয়ে যাচ্ছে সুখী এক নদীর মত। ওরা কত তৃপ্তি নিয়ে বেঁচে বর্তে আছে। ওদের চোখেমুখে স্বপ্ন আর ভালবাসার উজ্জ্বলতা– সব চারিদিকে উদ্ভাসিত হয়ে বিস্তার লাভ করেছে। সেই উজ্জ্বলতায় অবগাহিত হতে হতে ও একটু হেসে ওঠে, কিন্তু কোন আনন্দ পায় না এবং এতে ও বুঝল হাসি পেলেই সুখী হওয়া যায় না। সুখ এমন একটা দুর্লভ বস্তু, হাসির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, যেমন কান্নার সঙ্গে দুঃখের। কেননা কান্নার পরেও আনন্দ পাওয়া যায়। অবাক কা- কেন যে অমন হয়! আবার সুখের পরেও কান্না আসে। সত্যি সবই রহস্যে ভরা!

চার.

ঠিক সেই সময় একটা বিশাল বাড়ির সামনে আসতেই ওকে দেখে এক মস্ত বড় কুকুর হঠাৎ করে ঘেউ ঘেউ শব্দে ডেকে উঠল। কী ভীষণ আওয়াজ। চারিদিক কেঁপে ওঠে। আচ্ছা, সবাই তো চলেছে। তাদের বেলায় কিছু ঘটল না, তার বেলায় কেন এমন হল! ও ভাবে নিশ্চয় ওর চেহারার মধ্যে অলুক্ষুণে এমন কিছু নেতিবাচক বিষয় আছে যা দেখে অতি সংবেদনশীল মানুষ বা প্রাণিকুলের মাঝে কোন বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তা না হলে এমন অস্বাভাবিকতা কেন ঘটবে!

সেদিন আর এক ঘটনা ঘটল। বেশ কয়েক বছর আগে ওর বউ মারা গেছে। এখনও একা, বিয়ে করা হয়নি আর হবেও না। যে বয়সে বউ মারা গেলে ভাগ্যবান হওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক পরে, বেশি বয়সে এমন দুঃখজনক বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। তারপরেও লোকে বলে, সে নাকি বউকে অবহেলা করে করে মানসিক কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছে। সাধারণত স্বামী মারা গেলে বউয়ের ঘাড়ে এমন দোষ পড়ে।

ও অমন কোন ধনীবৃদ্ধ নয়, যে টাকাপয়সা, জমি-জিরাত বা বাড়ি-গাড়ির বিনিময়ে বিয়ে করে গরিব ঘরের নতুন রূপসী বউ নিয়ে শেষ বয়সে সংসার বাঁধতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই সে একা একা থাকতেই ভালবাসে। তার ওপর ওর বাসায় বদনামের ভয়ে কেউ আসেও না, বিশেষ করে মহিলারা। ও আবার নির্লজ্জ-বেহায়াও হতে পারে না, যা না হলে প্রেম-পিরিতে বিপরীত লিঙ্গধারিণীর কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তবে বুঝেছে বিপত্নীক বা অবিবাহিত থাকলে সামাজিক সম্মান-শ্রদ্ধা পাওয়া বেশ কঠিন।

কিন্তু তার বেলায় হয়েছে উল্টোটি। পোড়া কপাল আর কাকে বলে! আর ও অমন কোন ধনী-বৃদ্ধ নয়, যে টাকা-পয়সা, জমি-জিরাত বা বাড়ি-গাড়ির বিনিময়ে বিয়ে করে গরিব ঘরের নতুন রূপসী বউ নিয়ে শেষ বয়সে সংসার বাঁধতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই সে একা একা থাকতেই ভালবাসে। তার ওপর ওর বাসায় বদনামের ভয়ে কেউ আসেও না, বিশেষ করে মহিলারা। ও আবার নির্লজ্জ-বেহায়াও হতে পারে না, যা না হলে প্রেম-পিরিতে বিপরীত লিঙ্গধারিণীর কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তবে বুঝেছে বিপত্নীক বা অবিবাহিত থাকলে সামাজিক সম্মান-শ্রদ্ধা পাওয়া বেশ কঠিন। সবাই কেমন যেন অন্যরকম ভেবে সন্দেহের চোখে দেখে। বিশেষ করে মহিলা মহল। কথা বলতে গেলে তারা ভাবে প্রেম করতে চাচ্ছে। তাই এমতাবস্থায় ও মনে-প্রাণে চায় ওর বাসায় ছেলে বা মেয়ে যেন কেউ না আসে এবং সে-ও কারো বাসায় যাবে না। এমনই একটি অলিখিত নিয়ম ও মেনে চলে।

পাঁচ.

সেদিন এক জায়গায় ওর বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কী রে কেমন আছিস, বহুদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। হ্যাঁ, শোন, তোর ভাবী তোকে খুব খুঁজছে, দেখা করিস। বুঝতে পারে, একাকী জীবন বলে সবাই এক ধরনের সহানুভূতি দেখায়। এ তার নিদর্শন। বেশ ভাল কথা। বিবিধ বাস্তব কারণে তা হতেই পারে। খানিক পরে ভাবীর সঙ্গে দেখা হতেই ও বলে ওঠে, ভাবী কেমন আছেন? আপনি না কি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? তখন দেখি ভাবীর চেহারা হঠাৎ করে কেমন জানি অন্যরকম হয়ে উঠল। বললেন, কী যে বলেন। আপনি আমাকে কী মনে করেন। আমি কি অমন!

আরে না না, তা হবে কেন, আপনি অন্যভাবে নেবেন না আমার কথা। আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে বলে তাই বলেছি।

ও তাই বলেন। ভাই, ভাল আছেন তো, আপনার ছেলেটা ভাল? ও কেমন আছে?

ভাবী মনে-প্রাণে আগের থেকে সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে উল্টে গেছেন দেখা গেল। হায় হায়, এই জীবন এমন করে চালালে এমনই হতে হবে। এর কি অন্যথা হবে না?

এরপরে যে দু'টি ঘটনার দেখা পাওয়া যায় তা আরও ভয়াবহ। বউ মারা যাওয়ার পর ও সাধারণত কোনও বিয়েতে যায় না। ও মনে করে, বিয়ের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র বিবাহিত যারা, তাদের যার যার জীবনসঙ্গী-সঙ্গিনীদের নিয়ে যোগ দেওয়া উচিত এবং সেখানে বিধবা, বিপত্নীক, তালাকপ্রাপ্ত একাকী জীবনধারীদের যাওয়া আইন করে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। তা না হলে অন্যরকম অবাঞ্ছিত ঘটনার অবতারণা হয়। যেমন ও একবার এক বিয়ের আসর থেকে সরাসরি তৎক্ষণাৎ চলে আসতে বাধ্য হয় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এক মর্মঘাতী উক্তিতে। বন্ধুটি সবসময় এমন ধরনের কথা বলতেই অভ্যস্ত। সেইজন্যে সে বন্ধুমহলে পুংটা বন্ধু বলে পরিচিত। জন্মদিনে বলে যেমন, ও তুই এখনও মরিসনি তোর জন্মদিনে দোয়া করি, তুই যেন শিগগিরই মারা যাস। কিংবা, আমার সঙ্গে বহুদিন বাদে হঠাৎ দেখা হলে বলে ওঠে, আরে এটা তুই না তোর বড় ভাই, এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছিস।

সেই বন্ধুটি এক বিয়ের আসরে তাকে অকস্মাৎ দেখে বলে, আরে বিপত্নীক! তুই বিয়েতে এসেছিস! খাইছে আমারে! এই বরের তো বউ মারা যাবে! যা যা বিয়ের আসর থেকে ভাগ! তা না হলে নতুন বরের খুব অকল্যাণ হবে।

কথাটা শুনে ওর মন খুব খারাপ হয়ে যায়। ও সত্যি সত্যিই বিয়ের আসর থেকে তাড়াতাড়ি সবার অলক্ষ্যে চুপি চুপি চলে আসে। ঠাট্টা যে কত ভয়ঙ্কর হয়!

ছয়.

এরকম আর একটা অনভিপ্রেত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে ও এবং সেটা খুব অসম্মানজনক আর লজ্জাকরও ওর জন্যে। ব্যাপারটা হল, ও একজনকে একটা কাজ দিয়েছিল। মোটামুটি বড় অংকের ভাল কাজ। কিন্তু সেটার কী অগ্রগতি হচ্ছে তা সে জানতে পারছিল না। তাই ও তাকে খুব জরুরিভাবে তালাশ করা শুরু করেছিল। এতে তারই বেশি লাভ হবে কিন্তু তাকে কোথাও পায় না। শেষ পর্যন্ত ওর দেওয়া একটা কার্ড থেকে বায়ু ফোনে যোগাযোগ করা শুরু করে। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। তাই সে অগত্যা সাধারণ ফোন দিয়ে খোঁজা শুরু করে। এক ভদ্রমহিলা ফোন ধরেন। ও বলে, সে সেখানে আছে কি-না। অন্য দিক থেকে তার কথার উত্তর না দিয়ে মহিলা কণ্ঠ বলে, আপনি কে বলছেন?

উত্তরে ও নামটা ধীরে ধীরে বলে।

কোথা থেকে বলছেন?

ও বলে, ভাই এতকিছু বলা যাবে না। বলে ফোনটা রেখে দেয়। নম্বরটা যে তার বাসার তা তো জানে না। অফিসের কাজে বাসাকে ব্যতিব্যস্ত না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর দরকারের সময় এত কথা শোনা যায়। আসল কথাটা বললেই তো হয়, যাকে খোঁজা হচ্ছে, সে আছে কী নেই। সেটা বললেই তো এতকিছু বলা লাগে না। কী যে মহা ঝামেলা! খানিক পরেই একটা ফোন আসে, সেই আগের মহিলাকণ্ঠ। আপকি কি সেই যে আগে কথা বলছিল?

হ্যাঁ, আমি সে-ই।

শুনুন আমি তার স্ত্রী, যাকে আপনি খুঁজছেন। আপনি কোন কথা না বলে অভদ্রের মত অমন করে ফোনটা রেখে দিলেন কেন? ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কেমন করে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় আপনি সেটা জানেন না। শিখে নেবেন। এরপর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ভদ্রভাবে কথা বলবেন, ও কে।

সে-ও বলে, ও কে।

অভাবনীয় কা-! পরে তার সঙ্গে কথা হয়, সেই-ফোন করেছিল। বললাম, আরে মিয়া তুমি কোথায় ছিলে?

ভাই আর বলবেন না। আমি সেই নেত্রকোনায় ছিলাম, তাই খুঁজে পাননি।

বেশ ভালই হল। মাঝখান থেকে তোমাকে খুঁজতে গিয়ে তোমার বউয়ের ঝাড়ি খেলাম। আমি তো বুঝিনি তোমার বাসায় ফোন চলে গিয়েছিল।

হায় রে আমার কপাল, সারাজীবন মেয়েদের কাছ থেকে শুধু অকারণে অপমান অসম্মানই জুটল! তা না হলে বিয়ে-করা বউয়েরা কেন সবসময় বলে থাকে সব স্বামীদের প্রতি– আমি যদি বিয়ে না করতাম তাহলে তোমার মত অপদার্থকে কে বিয়ে করতে আসত?

তাই কোন দুঃখবোধ হয় না এবং এমন সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছনো যায় যে, যাদের দেখে সম্মান-সমীহ জাগে না, যারা দেখতে অনাকর্ষণীয় বা কালো তাদের সাধারণত তিনটি শ্রেণী কোনদিন পছন্দ করে না। এক. মহিলাকুল; দুই. কুকুর আর তিন. দারোয়ান বা প্রতিরক্ষাদলের সদস্য।

সাত.

তা না হলে এত এত বিড়ম্বনা হয়! একবার বিদেশী এক রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা-ডিনার, শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে। ও আমন্ত্রণপত্রটা দেখায় গেটে। ওকে দাঁড় করিয়ে প্রতিরক্ষকেরা আদ্যপান্তভাবে অতিথি-তালিকায় ওর নামটা খোঁজে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পায় না। সে এক সেনাকর্তাকে বলে, কোন কাজ হয় না। ও দাঁড়িয়েই থাকে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি দেখে ও কে, আই ডোন্ট মাইন্ড এট অল– বলে স্মার্টলি ও চলে আসা শুরু করে। ফিরতি পথে এক পরিচিত গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে দেখা– কী ব্যাপার আপনি চলে যাচ্ছেন!

ভাই আমার নাম লিস্টে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই, চলে যাচ্ছি।

ও বলে, আরে দূর আমার সঙ্গে আসেন তো!

না ভাই, যাই, থ্যাংকু!

আরো অনেক এরকম অঘটনের কথা বলতে পারে। এক সভার সভাপতিত্ব করতে হবে জাদুঘরের বিষয়ে। ঢোকার মুখে এক আনসার আটকাল, কার কাছে যাবেন? সব বলার পরেও বলে, এখানে খাতায় সই করেন। নাম-ঠিকানা-ফোন নাম্বার লেখেন।

কামাল আতাতুর্ক রোডের এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নবীনবরণ উৎসবে ও বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিল কিছুদিন আগে। পনেরো তলা ভবনের নয় তলাতে অনুষ্ঠান। আজকাল ভবনের ভুবনে ভুবনে সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-ব্যবসায়ের মত এমন মহৎ ব্যবসায় আর হয় না।

এটা অন্য কথা, হ্যাঁ যেটা বলা হচ্ছিল। সেই সুউচ্চ ভবনের লিফটের মুখে তকমা-আঁটা প্রতিরক্ষাকারী সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। আসলে ওদের কোন দোষ নেই। ওদের যা বলা হয় ওরা সেটা সেইমত করে। এখন ওর মত এরকম কালো বদখত দেখতে অতি সাধারণ চেহারার একজনকে দেখলে সন্দেহ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। তাই সব জিজ্ঞাসাপর্ব চলে।

ওর এসব সহ্য হয় না। ও আস্তে করে কোন প্রতিবাদ বা কথা না বলে চলে আসে। পরে সবাই জিজ্ঞেস করে, স্যার আপনি কোথায়, এলেন না, সভা শুরু হয়ে যাচ্ছে যে। ও বলে, ভাই আমাকে দারোয়ানরা ঢুকতে দিল না, কালো, দেখতে খারাপ তো তাই। আমি বাসায় চলে এসেছি। ডোন্ট মাইন্ড।

আট.

আসলে যে যেমন সে তেমনটিই পেয়ে ও হয়ে থাকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। একজন মানুষ অন্যের কাছ থেকে তেমন ব্যবহারই পেয়ে থাকে, যা সে অর্জন করেছে দিনে দিনে ক্রমাগতভাবে এবং সে তেমনই। এই বিষয়টিকে যদি ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত ও ব্যাখ্যা করতে কেউ চায়, তা সে করতে পারে।

ও সবার কাছে যেমনভাবে গ্রহণীয়, বিবেচ্য তেমনি সে। যার গ্রহণযোগ্যতা যেমন, তেমন সে ব্যবহার পেয়ে থাকে। এতে অন্যের দোষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ও সবমিলে তার আচার-ব্যবহার আর কৃতির মাধ্যমে সমাজের কাছে এমনভাবেই চিহ্নিত হয়ে গেছে প্রাকৃতিকভাবে এবং স্বয়ংক্রিয়রূপে। এতে অন্যরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে, এমন বলা যায়, প্রমাণিতও করা যায় সহজে, যদিও তা হাস্যকর মেকি ও কৃত্রিম। কারণ খারাপ বা উগ্রতামূলক, অসম্মানজনক, নিষ্ঠুর ও অমানবিক, ঔপনিবেশিক খোয়ারির জমিদারসুলভ ব্যবহার করে কখনও ব্যক্তিত্ব অর্জন করা যায় না। ও ভাবে আবার বিপরীতে, এত কিছুর পরেও এতসব অযাচিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কোন কিছুতেই কোন কিছু এসে যায় না। যা হবার সবকিছুই এমনি এমনিই হয়ে হয়ে যায়। হয়ে যেতে থাকে আপনা-আপনিই। এটা স্বাভাবিকতা। এটাই সমুদ্র, এটাই জীবন, এটাই ব্রহ্মা-। জীবনে যা কিছু ঘটে তুচ্ছ, গুরুত্বপুর্ণ, প্রধান, গৌণ, নগণ্য, অপমানজনক, সম্মানজনক ঘটনা-দুর্ঘটনা– সব জীবনেরই অংশ। অতএব তার কোন দুঃখ পরিতাপ হয় না। সবই বরং খুব উপভোগ্য। জীবনের প্রবহমানতা গড়িয়ে গেলে স্মৃতির জাদুঘরে জমা হয় সেটিই আবার জীবনের জাদুঘর। সেখানে সবই মন্থর। এমনকি অপমান, অসম্মান এবং অবহেলা– সব।

ও হঠাৎ আকাশের নীলে চোখ রেখে ধীরে ধীরে নিজের বোধে হারিয়ে যেতে থাকে।

রবিউল হুসাইন
স্থপতি, কবি, কথাকার

ও ভাবে আবার বিপরীতে, এত কিছুর পরেও এতসব অযাচিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কোন কিছুতেই কোন কিছু এসে যায় না। যা হবার সবকিছুই এমনি এমনিই হয়ে হয়ে যায়। হয়ে যেতে থাকে আপনা-আপনিই। এটা স্বাভাবিকতা। এটাই সমুদ্র, এটাই জীবন, এটাই ব্রহ্মা-। জীবনে যা কিছু ঘটে তুচ্ছ, গুরুত্বপুর্ণ, প্রধান, গৌণ, নগণ্য, অপমানজনক, সম্মানজনক ঘটনাদুর্ঘটনা– সব জীবনেরই অংশ। অতএব তার কোন দুঃখ পরিতাপ হয় না। সবই বরং খুব উপভোগ্য।

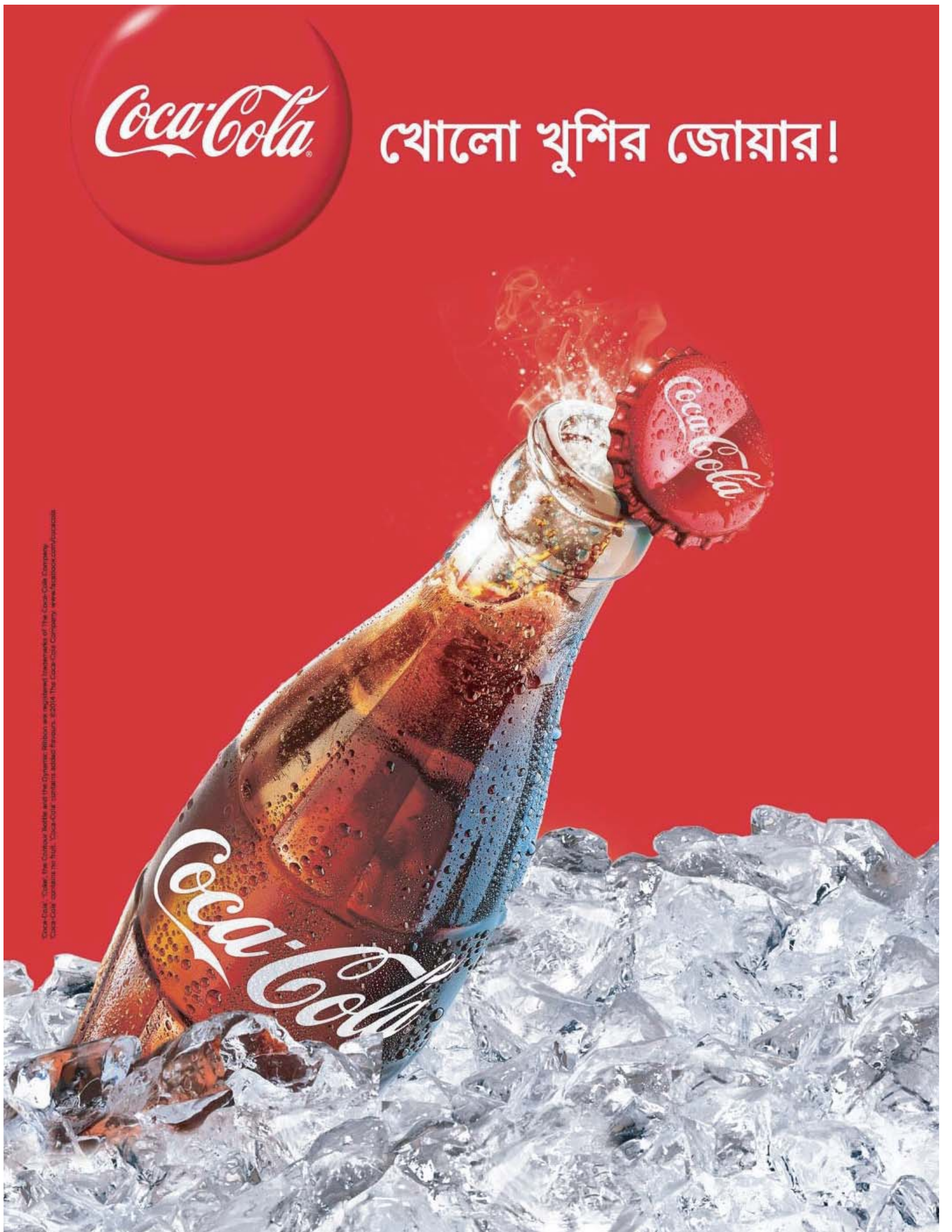
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

ছোটগল্প

তৃতীয় পক্ষ

ঋতা বসু

আমি জানি তুমি এখন পাশের ঘরে কাঁদছ। অনির্বাণদের বাড়ি থেকে সম্মতি জানিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করতে বলে চলে যাবার পর মাসিরা, ছোট মেসো, জ্যাঠা-জেঠি আরও খানিকক্ষণ ছিল। আমি আমার ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে নিয়েই কথা বলছে। প্রত্যেকের গলাতেই এক সুর– রাজি হয়ে যাও। এমন ছেলে আর পাবে না।

তুমি চুপচাপই ছিলে আগাগোড়া। চুপ করে থাকার মধ্যে দিয়ে তোমার দ্বিধা ধরা পড়ছিল। একবার মৃদুস্বরে বললে– বড্ড দূর। কানাডা কি এখানে? ইচ্ছে করলেও টুপুর আমার কাছে আসতে পারবে না।

বড় মাসি তোমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল হুট বলতে কে আসতে পারে? বুলবুলির তো কানাডার তুলনায় ঘরের কাছে বম্বেতে বিয়ে হয়েছে। এই পাঁচ বছরে ক'বার এসেছে বল দেখি?

তুমি তবুও দুর্বলভাবে বলেছিলে– তোমরা আর কেন যে অন্য ছেলে দেখতে চাইছ না–

এবার ছোট মেসো ধৈর্য হারায়– সাধাসাধি বলেই পায়ে ঠেলছ পানসি। প্রথম দেখাতেই মেয়ে পছন্দ হয়ে বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাওয়া যে কত বড় ব্যাপার সে আমি হাড়ে হাড়ে জানি।

আমি এ ঘর থেকে পরিষ্কার তোমার অবস্থা কল্পনা করতে পারছি– সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু। অভিমন্যু অবশ্য খানিকটা লড়াই করেছিল। তুমি তার ধার দিয়েও যাও না। মুখে সারাক্ষণ মৃদু হাসি। সবরকম সংঘাত সন্তর্পণে এড়িয়ে যাও। তুমি সবার সঙ্গে আছ আবার নেইও। তোমার পছন্দ-অপছন্দ আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। জ্ঞান হয়ে থেকে তোমাকে দেখছি। আমার জগৎ মানেই তুমি।

যতবার 'পানসি' ডাকটা শুনি প্রায় আসলের মত দেখতে থার্মোকলের ফুলের মালা গলায় দেওয়া কপালে চন্দনের টিপ বাবার ছবিটির কথা মনে পড়ে। বাবার ডাকনাম ছিল পানু আর মায়ের মানসী– দুই-এ মিলে হয়ে গেল পানসি।

জ্যাঠা বলল– শুধু সুন্দরী হলেই কিন্তু হয় না। পাত্রপক্ষ আজকাল অ্যাকাডেমিক সাইডটাও দেখে। টুপুরের সেটা একদম সাধারণ। এরপর ভাল পাত্র যখন ওকে রিজেক্ট করবে তখন কিন্তু তোমাকে হাত কামড়াতে হবে।

তুমি অবশ্য ভাবতেই পার না কেউ তোমার টুপুরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তুমি পাত্রপক্ষের সামনে নম্র বিনত হয়ে থাকবে এবং আমি জানি শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও খুঁত বার করে বাতিল করে দেবে। এই অবস্থাটাই আমাদের দু'জনের জন্য সব থেকে আরামদায়ক। সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না।

আমি এ ঘর থেকে পরিষ্কার তোমার অবস্থা কল্পনা করতে পারছি– সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু। অভিমন্যু অবশ্য খানিকটা লড়াই করেছিল। তুমি তার ধার দিয়েও যাও না। মুখে সারাক্ষণ মৃদু হাসি। সবরকম সংঘাত সন্তর্পণে এড়িয়ে যাও। তুমি সবার সঙ্গে আছ আবার নেইও। তোমার পছন্দ-অপছন্দ আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। জ্ঞান হয়ে থেকে তোমাকে দেখছি। আমার জগৎ মানেই তুমি। তোমার তাকানো, কাজ করবার ভঙ্গি, এমনকী আমার সামনে দিয়ে শুধু হেঁটে চলে গেলেও আমি তোমার মনের মধ্যেটা দেখতে পাই। তোমার একটুও ইচ্ছে করছে না এই পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক অথচ এতজন শুভার্থী হিতৈষীকেও অগ্রাহ্য করতে পারছ না। সেই কবে বাবা চলে গিয়েছেন। তারপর থেকে এদের ভরসাতেই তো তুমি এতগুলো বছর একলা আমাকে নিয়ে কাটিয়ে দিলে।

সত্যি আমি কোনও দিন বুঝতে পারিনি আমাদের বাড়িতে রোজগেরে লোক বলতে যা বোঝায় সেরকম কেউ নেই। মা, এর পুরো কৃতিত্বটাই তোমার প্রাপ্য। আত্মীয়স্বজনরা যতই বাবার রেখে যাওয়া টাকাটার কথা বলুক না কেন আমি তো জানি, তুমি কীভাবে হিসেব করে প্রতিটি পা ফেলেছ। এত ভাল অঙ্ক কোথায় শিখলে মা? বাবা যখন গেলেন– তোমার বয়স সাতাশ। আমার তো খুব আবছা একটা হাসিখুশি মুখ, গমগমে গলার আওয়াজ, অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা দু'চারটে ছেলে ভুলোনো ছড়ার টুকরোটাকরা লাইন ছাড়া আর কিছু মনে নেই।

কী করে পারলে মা? এতগুলো বছর একা একদম একা আঁচলের আড়াল তুলে ঝড়ো বাতাস থেকে প্রদীপের নরম আলোটা বাঁচিয়ে রাখার মত আমাকে বাইরের পৃথিবীর ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল করে রেখেছ।

আমার ব্যাপারে তোমার নিজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত তবু অল্পস্বল্প রদবদল করে সাধ্যমত সবাইকে খুশি করে এতদিন পার পেয়ে গিয়েছ। এইবার মহাবিপদ। সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। সবাই একদিকে তুমি অন্যদিকে।

আমি শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম আমাদের এই স্বস্তিকা আবাসনের ভারী লোহার গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার ঘরের জানালাটা দিয়ে যে মস্ত কদম গাছটা দেখা যায় সেটাতে ফুল আসতে এখনও তিন মাস দেরি। প্রতিদিনই লেখা শেষ করে গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ ঘুম আসছে না। চোখ জ্বালা করছে। বেলতলার এই আটশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটা থেকে কানাডা কত দূরে? তুমি কেন জোর দিয়ে বলছ না মা– দূর বলে নয় এখন তুমি টুপুরের বিয়েই দেবে না। আমি নিজে বলতে পারি না কারণ ছোটবেলা থেকে নিজের কথা বলবার অভ্যেসই হয়নি। তোমার কথা মেনে নেওয়াটা তুমি আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ঢুকিয়ে দিয়েছ যে আমি আমার বয়সি আর পাঁচটা মেয়ের থেকে কবে যেন আলাদা হয়ে গিয়েছি। তোমার ছাঁচে আমার জীবন ঢালাই হয়ে গিয়েছে। নিজের সময়ের থেকে আমি অনেক বেশি তোমার কালের কাছাকাছি।

বেলতলার এই আটশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটা থেকে কানাডা কত দূরে? তুমি কেন জোর দিয়ে বলছ না মা– দূর বলে নয় এখন তুমি টুপুরের বিয়েই দেবে না। আমি নিজে বলতে পারি না কারণ ছোটবেলা থেকে নিজের কথা বলবার অভ্যেসই হয়নি। তোমার কথা মেনে নেওয়াটা তুমি আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ঢুকিয়ে দিয়েছ যে আমি আমার বয়সি আর পাঁচটা মেয়ের থেকে কবে যেন আলাদা হয়ে গিয়েছি। তোমার ছাঁচে আমার জীবন ঢালাই হয়ে গিয়েছে।

সেই জন্যই বোধহয় অনির্বাণের মা-বাবার আমাকে এত পছন্দ হয়েছে। কতবার বললেন– মেয়েকে খুব ভাল শিক্ষা দিয়েছেন।

তোমার গর্বে ঝলমল মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল তোমার জীবনে আনন্দের অবকাশ এত কম আর আমার জন্য ত্যাগের পর্বটা এত বিরাট যে এই সামান্যটুকু দিতে পারলেও আমার ভাল লাগে।

সেই কোন ছোটবেলায় বড় মাসি না কার কাছে যেন বকুনি খেয়ে তর্ক করেছিলাম বলে তুমি আমাকে একটা খাতা দিয়ে বলেছিলে– বড়দের মুখে মুখে তর্ক না করে রাগ বা দুঃখ হলে বরং খাতায় লিখে রেখ।

সেই থেকে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে নিজের সঙ্গে কথা বলা।

এখন খুব ইচ্ছে করছে তোমার পাশটিতে তোমার গায়ের ওমে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু আমার প্রায় কোনও ইচ্ছেই যেমন কাজে পরিণত করা হয়ে ওঠে না তেমন এটাও হল না।

দুই.

আজ অনেক দিন বাদে আবার খাতাটা নিয়ে বসার অবসর পেলাম। এক পশলা বৃষ্টিতে চারিদিক ভিজে ভিজে হয়ে আছে। কদম গাছটা ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। গাছে থাকলে ফুলগুলো কী সুন্দর দেখায়। খসে পড়লে মনে হয় বাচ্চা ছেলের ছোট্ট ন্যাড়া মাথা।

তুমি সকাল থেকে আমার আর অনির্বাণের জন্য অনেকরকম রান্নাবান্না করেছ। অনির্বাণ বেরিয়েছে ভিসা সংক্রান্ত কাজে। ইচ্ছে ছিল আমিও সঙ্গে যাই। আমি কিছু বলার আগেই তুমি আমার হয়ে সিদ্ধান্ত নিলে– খেয়ে উঠে রোদে বেরুলেই টুপুরের মাথা ধরে। ও বরং একটু জিরিয়ে নিক। তুমি কাজটা সেরে এস।

ভালই করেছ বলে। আমি আমার ঘরের আরামটা উপভোগ করছি তারিয়ে তারিয়ে। এই ঘরটা ছেড়ে কালকেই চলে যেতে হবে। আর দশ দিন বাদে একেবারে কানাডা। আমার বুকটা টনটন করছে। চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। স্বস্তিকা আবাসনের ঠিকে ঝি আর দারোয়ানকেও আমার থেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।

অনির্বাণের কথা শুনে মনে হল সত্যিই তো– আমার বন্ধুরা কত সময়ে মাসি-পিসির বাড়ি রাত কাটিয়েছে। কখনও তারা আমার বাড়িতেও থেকেছে। তোমার আদর-যত্নে মুগ্ধ হয়ে বারবার এসেছে কিন্তু আমি কারও বাড়িতে একটি রাতও কাটাইনি। এইরকম অসম্ভব কল্পনাও কেউ করতে পারেনি। সেইখানে তোমাকে ছেড়ে আমাদের ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম চার চারটে দিন।

কানাডা যেতে আমার হয়তো খারাপ লাগত না যদি তুমি সঙ্গে থাকতে। বেশ তো ছিলাম আমরা দু'জনে মিলে। কেন তুমি সবার কথা শুনে আমার বিয়ে দিলে? আমার থেকেও তোমার বেশি কষ্ট হচ্ছে নয়তো চার পাঁচ দিনে কারও চেহারা এত খারাপ হয় না।

বিশ্বাস কর– তোমাকে এখানে একা রেখে আমি একদিনের জন্যও শান্তি পাব না। কে দেখবে তোমাকে মাইগ্রেনে যখন কষ্ট পাবে। ডিভানের ভারী ডালা তুলে কে রোজ বার করে দেবে মশারি, চাদর? শীতের সময়ে লেপ-কম্বল?

মা– এখনও সময় আছে। যে যা-ই বলুক– তুমি একবার বললেই থেকে যাব তোমার কাছে। কী শান্তি কী আরাম আমাদের এই নির্জন দু'কামরা ফ্ল্যাটে। শুধু তুমি আর আমি। ঝগড়াঝাঁটি, তর্কবিতর্ক, মান অভিমান কিছু নেই। আছে শুধু পরস্পরকে জড়িয়ে নির্ভর করে থাকা।

দেখ আজ আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম ছোটবেলা থেকে খাতায় যত মনের কথা বলেছি সব তোমাকে উদ্দেশ করে। আমাদের এই দু'জনের জগতে কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। আমাদের কোনও প্রয়োজনও ছিল না। এই ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছে কিন্তু অনির্বাণের কথায় এই প্রথম আমি সচেতন হয়ে খেয়াল করলাম সেটা। ওদের বাড়িতে প্রথম রাতে আমার শুকনো মুখ দেখে সবাই যখন ধরেই নিয়েছে আমার শরীর খারাপ লাগছে তখন অনির্বাণ একান্তে আমাকে বলেছিল– আসলে জীবনে এই প্রথম অন্য বাড়িতে রাত কাটাতে হবে বলে তুমি ভয় পাচ্ছ।

অনির্বাণের কথা শুনে মনে হল সত্যিই তো– আমার বন্ধুরা কত সময়ে মাসি-পিসির বাড়ি রাত কাটিয়েছে। কখনও তারা আমার বাড়িতেও থেকেছে। তোমার আদর-যত্নে মুগ্ধ হয়ে বারবার এসেছে কিন্তু আমি কারও বাড়িতে একটি রাতও কাটাইনি। এইরকম অসম্ভব কল্পনাও কেউ করতে পারেনি। সেইখানে তোমাকে ছেড়ে আমাদের ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম চার চারটে দিন। এরপর তো আরও কত দিন কত রাত।

তুমি বিয়ের আগে প্রায়ই বলতে হয়তো ঠাট্টা করেই– ওদের বাড়িতে কত লোক, কত মজা করবি। ঘুরবি বেড়াবি মা'র কথা মনেই পড়বে না।

অনির্বাণের ব্যাচেলর মামা কাছেই থাকেন। রোজ রাতে খেতে আসেন শুনে তুমি বলেছিলে– সর্বনাশ, তবে তো বুড়োর বকবকানি রোজ শুনতে হবে।

আর একটা কথা তুমি বারবার জিজ্ঞেস করতে– অনির্বাণের মাকে মা ডাকতে পারবি? কতবার বলেছ– ছোটবেলা থেকে কোনও দিন কারওকে বাবা ডাকিসনি। দেখিস প্রথম প্রথম তোর খুব অসুবিধে হবে।

এইভাবে আস্তে আস্তে কখন যেন অনির্বাণের বাড়ির লোকজনদের ওপর আমার বিতৃষ্ণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই দূরত্ব থেকেই এখনও আমি সরাসরি সম্বোধন এড়িয়ে চলছি। অবশ্য অনির্বাণ যখন তোমাকে মা বলে ডাকে তখন গর্বমিশ্রিত আনন্দে বুক ভরে যায়। আমার মাকে 'মা' বলা কত সহজ তা-ই না মা?

কিন্তু সব থেকে গোপন ও অসুবিধেজনক ব্যাপার হল অনির্বাণের সঙ্গে একলা হতে আমার ভয় ও অনিচ্ছা। আড্ডায় সিনেমায় রেস্টোরাঁয় অনির্বাণের মত সঙ্গী হয় না কিন্তু ওর সঙ্গে একা ঘরে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। মনে হয় কী যেন একটা ঘটবে যা ঘটা উচিত নয়। এক একটা বাহানা করে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটা এড়িয়ে যাচ্ছি। জানি না কত দিন পারব। অনির্বাণ কিন্তু কোনও জোর করে না। খুব স্বাভাবিকভাবে কানাডার গল্প করে। জানতে চায় আমি কী ভালবাসি। কী করে সময় কাটাই। আমার বন্ধু আত্মীয়স্বজনের কথাও। ওর ভাবভক্তি দেখে মনেই হয় না কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটছে।

চার দিন পর কাল রাতে নিজের ঘরে ঢুকতেই এত আরাম হল যে অনির্বাণকে বললাম, কেন তোমরা আমাকে পছন্দ করলে বল তো? সেই জন্যই তো সাত তাড়াতাড়ি দেশ ছেড়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে মাকে ছেড়ে কোথায় চলে যেতে হচ্ছে।

ও বলল– তোমার এত কষ্ট হবে বুঝতে পারিনি। অনেকগুলো ছবির মধ্যে তোমার মুখটাই মনের মধ্যে গেঁথে গেল। তাই সোজা চলে এলাম টুপুরের কাছে। সেই থেকে বুকের মাঝে বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর।

অনির্বাণ আমার দিকে এক পা এগিয়ে আসে। আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা জলের স্রোত নেমে যায়। বুকের মধ্যে বাতাসের অভাব। কী করলে ঠিক হয় এই সময়ে বল তো?

গতকাল রাতে আমরা দরজা খোলা রেখে শুয়েছিলাম। আমি অনির্বাণকে আগেই বলে রেখেছিলাম– আমাদের বাড়িতে যে দু'রাত থাকব দরজা খোলা থাকবে। মা'র চোখের সামনে আমি দরজা বন্ধ করে শুতে পারব না।

অনির্বাণ কিছু বলেনি। শুধু আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে ছিল যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি হাসছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগেও ছিল। কিন্তু চোখ দুটোতে ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। আমি আর অনির্বাণ দুজনেই চুপ করে বসে কদম গাছটার ডালপাতার ওপর আলোছায়ার কাটাকুটি খেলা দেখলাম কিছুক্ষণ। অনির্বাণ হঠাৎ বলল– সব কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারতাম যদি সুযোগ দিতে।

অনেক রাত পর্যন্ত চোখ মেলে জেগে শুয়েছিলাম। খানিকটা আগে বৃষ্টি হয়েছিল। এখনও চারপাশের গাছপালাগুলো থেকে টুপটুপ জল ঝরেই চলেছে। জল ঝরার সেই শব্দের সঙ্গে অনির্বাণের ঘুমন্ত ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ মিশে যাচ্ছিল। আমার বিছানাটা একজনের জন্য বড় হলেও দু'জনের জন্য ছোট। আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কী যেন একটা ব্যথা ভারী হয়ে বুকের মধ্যে চেপে বসেছিল।

আর একটু রাতের দিকে ঘরের বাইরে হালকা পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম। আমাদের পর্দার আড়ালে শব্দটা থেমে ছিল খানিক্ষণ। আমি একাগ্র হয়ে অনির্বাণের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু চোখ ছিল পর্দার বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকারে। আমি কিন্তু একটুও বদলাইনি মা অথচ তুমি নিঃসংকোচে আগের মত ভেতরে ঢুকে আসতে পারলে না।

অনেক রাত পর্যন্ত চোখ মেলে জেগে শুয়েছিলাম। খানিকটা আগে বৃষ্টি হয়েছিল। এখনও চারপাশের গাছপালাগুলো থেকে টুপটুপ জল ঝরেই চলেছে। জল ঝরার সেই শব্দের সঙ্গে অনির্বাণের ঘুমন্ত ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ মিশে যাচ্ছিল। আমার বিছানাটা একজনের জন্য বড় হলেও দু'জনের জন্য ছোট। আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কী যেন একটা ব্যথা ভারী হয়ে বুকের মধ্যে চেপে বসেছিল।

তিন.

আমাদের ফ্ল্যাটের পেছনের বারান্দায় দাঁড়ালে কাঁঠাল আর দেবদারু গাছের সারি চোখে পড়ে। এবার এসে লক্ষ্য করলাম এই গাছগুলো থেকে এত শুকনো পাতা ঝরেছে যে নিচে একটা আধ ইঞ্চি হালকা হলদে খয়েরি রঙের পাতার কার্পেট তৈরি হয়েছে। এবার এসে থেকে কেন জানি না এই বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে পাতাঝরা দেখতেই ভাল লাগছে। আগে কেন লক্ষ্য করিনি জানি না।

প্রায় দিনই কেউ না কেউ আসে। সবাই নেমন্তন্ন করছে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলছে। এত আদর-যত্ন ভালই তো লাগার কথা। সত্যিই তো কলকাতার রাজকীয় দিকটা তো আমার দেখাই হয়নি। এখন পয়সার অভাব নেই। আত্মীয়স্বজনের মনোযোগের মাত্রাও বেড়েছে তবু কেন যে কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছি না– কে জানে।

মা– তুমি জান না– প্রত্যেকবার কানাডা থেকে ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলবার পর আমার নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হত। তোমার শরীর খারাপের কথা নিঃসঙ্গতার কথা যত শুনেছি ততই অপরাধের বোঝা বেড়েছে।

তুমি অবশ্য নিজে থেকে বলতে চাওনি। আমি জিজ্ঞেস করে করে জেনেছি। শেষবার যখন বললে– ডাক্তার বলেছে এখনই চোখ অপারেশন করতে হবে। আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। অনির্বাণকে উত্ত্যক্ত করে ছ'মাসের মাথায় আবার চলে এসেছি।

অনির্বাণ বলেছিল– আর ছ'মাস বাদে যেও, দু'জনে মিলে একসঙ্গে যাব।

আমি শুনিনি। দরকার হলে ছ'মাস কি তারও বেশি থাকব। সেটাই ভাল হবে, তা-ই না মা?

তোমার হাসিমুখ আনন্দ উৎসাহ দেখে ভেবেছিলাম দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার হবে না। অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা চেক-আপের কথা যখনই বলি তখনই তুমি বল– দাঁড়া না, কতদিন বাদে এলি, এখনই চোখ বেঁধে বিছানায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। একটু তোর মুখটা দেখি। যা যা ভালবাসিস রান্না করে খাওয়াই, তারপর অপারেশন তো আছেই।

এই করেই কেটে গেল কত দিন। আসার পর অনির্বাণ ভালভাবে পৌঁছেছি কিনা জানতে ফোন করেছিল। তারপর থেকে সপ্তাহের মাত্র একবার খুব সংক্ষিপ্ত একটা ফোন করে জেনে নেয় কেমন আছি। কিছু দরকার আছে কি না।

অনির্বাণের মা জানতে চেয়েছিলেন ওঁদের কাছে কবে যাব। তুমি বললে– বারে– এতদিন তো ওদের ছেলের কাছেই ছিলি।

সত্যিই তো– তোমার অসুখ বলেই তো এসেছি, তোমার কাছেই থাকবার কথা। তবুও কেন যে সারাক্ষণ মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা অন্যায় ঘটছে। কোথায় যেন বেসুর বাজছে।

ওখানেও বোধহয় পাতাঝরা শুরু হয়েছে। অনির্বাণ বলেছিল কোন ফরেস্টে নিয়ে যাবে পাতাঝরা দেখাতে।

টুকরো টুকরো ছবি ঝরে পড়ছে পাতাগুলোর সঙ্গে। অনির্বাণ বলেছিল– একটা কোর্সে জয়েন করার কথা ছিল। সব ভুলে ছ'মাসের মাথায় দেশে দৌড় লাগাচ্ছ। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

– কী করব বল– মার শরীর খারাপ।

– তার থেকে ওঁকে এখানে এসে থাকতে বল। তুমিও ভাল থাকবে, উনিও ভাল থাকবেন। এইভাবে কলকাতা-কানাডা যাতায়াত কি সম্ভব?

আমি খুব চটে গিয়ে বলেছিলাম– তুমি এমনভাবে বলছ যেন মার পেটব্যথা করছে বলে যাচ্ছি। চোখ অপারেশন একটা মেজর ব্যাপার।

অনির্বাণ আর কথা বাড়ায়নি। আমার যা যা লাগবে গুছিয়ে দিয়েছে। সবার জন্য উপহার কিনে দিয়েছে। বিদায় নেবার আগে বলেছে– ভাল থেকো। গত ছ'মাসের সব কষ্ট উশুল করে নিও মার কাছে থেকে।

এখানে আসার উত্তেজনায় ওর কথা ভাল করে শুনিওনি। কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে ওখানকার প্রতিটি ছোটখাটো ঘটনা জ্বলজ্বল করে উঠছে মনের মধ্যে।

আমি যেন নতুন দেশে কোনওরকম অসুবিধেয় না পড়ি তার জন্য ওরই উদ্বেগ বেশি। তুমি তো জান মা ওখানকার জীবনযাত্রা কতটা যন্ত্র নির্ভর। আমার তো কিছু জানাই ছিল না। ভ্যাকুয়াম ক্লিন করতে গিয়ে দামি ক্রিস্টালের ফুলদানি ভেঙেছি। ডিশ ওয়াশার খারাপ করে ফেলেছি। এমনি আরও কত বোকামি।

অনির্বাণ জ্ঞান দেয়নি। রাগ করেনি। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সহজপাঠ হাত ধরে শিখিয়ে দিয়েছে।

কত ধীরে ধীরে অনির্বাণ আমার মনের মধ্যে থেকে ভয় বিতৃষ্ণা বিরাগ দূর করেছে। কোনও তাড়াহুড়ো করেনি। ছোটবেলা থেকে কোনও পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিনি। মেয়ে বন্ধুদের গণ্ডিটাও খুব সংকীর্ণ ছিল– তোমারই নির্বাচিত বন্ধুর দল। ছেলেদের প্রসঙ্গে তোমারই গড়ে দেওয়া ধারণা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছিল। মনের পরতে পরতে কত যে সন্দেহ ভয় দানা বেঁধেছিল তা নিজেই জানতাম না। অনির্বাণ আমাকে খুব আস্তে আস্তে একটা নতুন জগতের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। এখনও আমি পুরোপুরি সে জগৎটাকে জানি না কিন্তু এক অপ্রতিরোধ্য টানে আমি যেন ঢুকে পড়ছি সেখানে। ভেসে যাচ্ছি অসম্ভব এক ভাললাগায়। তোমাকে সেই রোমাঞ্চকর ভাললাগার গল্প করাই হয়নি। আমি জানি তোমার ভাল লাগবে না। জীবনে এই প্রথম তোমার থেকে নিজেকে আলাদা মনে হচ্ছে বলে চোরা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। অনির্বাণকেই প্রতিপক্ষ ভেবে আঘাত করতে ইচ্ছে করে।

অনির্বাণও ঘিরে রাখে আমাকে– তোমারই মত। কিন্তু ওর ধরনটা অন্যরকম। ও আঁকড়ে ধরে না। আমাকে ঘরে বাইরে স্বাবলম্বী করে তোলবার যতটুকু চেষ্টা ও করেছে তাইতেই নিজেকে আলাদা একটা মানুষ বলে চিনতে পারছি। আমি যে কারও ছায়া নই এই বিশ্বাস চারিয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে।

না চাইতেই অনির্বাণকে পেয়েছিলাম। অনির্বাণের দান আমার হাতের মুঠো ছাপিয়ে উপচে পড়েছিল অনাদরে। আমি তার মূল্য বুঝিনি, ওকে আমি কাঙাল প্রার্থীর ভূমিকাতেই দেখে এসেছি গত ছ'মাস। সম্রাজ্ঞীর আসন থেকে দীনহীনকে যেন করুণা করছি বলে মনে হত।

এবার অনির্বাণ আমাকে একবারের জন্যও ফিরে যেতে বলেনি। রন্নটিনমফিক কুশল প্রশ্ন করে ফোন রেখে দেয়। কোনও অনুনয় বিনয়, আবেগ, মন খারপের কথা– কিচ্ছু না।

বড় ভয় করছে মা আমি বোধহয় দেরি করে ফেলেছি। কখন যে আমাদের ভূমিকাটা বদলে গেল বুঝতে পারিনি।

আজ তুমি যখন বাজারে গিয়েছিলে– আমি নিজে তোমার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানতে চেয়েছিলাম অপারেশনটা কত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব। উনি বললেন, এখনই করবার কথা উনি ভাবছেন না।

আমি আর দ্বিধা না করে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের বুথ থেকে অনির্বাণকে ফোন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার টিকিট পাঠিয়ে দিতে বললাম।

– মা আমি ফিরে যেতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি। তুমি বাজার থেকে ফিরে আমাকে না দেখে আশ্চর্য হয়েছ। আমিও তোমাকে সত্যি কথাটা বলতে পারিনি। আমার এতটা আকুলতা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য তোমার ভাল লাগত না। আর তোমার না ভাললাগা মন ছাপিয়ে শরীরের ব্যাধি হয়ে আত্মপ্রকাশে বেশি সময় নেয় না।

তুমি অবশ্য জেনেই যাবে কারণ এই খাতা আমি এখানেই রেখে যাব। আর আমার নিজের সঙ্গে কথা বলবার প্রয়োজন নেই। আমার অনুভব দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনা ভাগ করে নেবার লোক আমি খুঁজে পেয়েছি।

এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাতাঝরা দেখছি। এই ঝরে পড়ার মধ্যে কেমন একটা অনিবার্য নিরন্তর আলগা ভাব আছে তা-ই না মা?

তোমাকে একলা রেখে চলে যাচ্ছি। তোমার প্রতিদিনের অবধারিত একাকিত্ব নিঃসঙ্গতা থেকে কী করে মুক্তি পাবে জানি না। ভীষণ স্বার্থপরের মত শোনালেও বলছি তুমি নিজেই একটা পথ খুঁজে নিয়ো মা।

এই পাতাঝরা একদিন শেষ হবে। নতুন কচি পাতা গজাবে গাছগুলোতে। আমি তখন এখানে থাকব না। পৃথিবীর অন্য কোণে আমার জীবন তখন অন্য খাতে বয়ে যাবে।

এখন আমি অপেক্ষা করছি।

ঋতা বসু
ভারতের কথাকার

marico

KEEP YOUR SKIN MOISTURIZED FOR 24 HOURS

EXPERIENCE IRRESISTIBLY SOFT AND SMOOTH SKIN WITH NEW PARACHUTE ADVANSED BODY LOTION.

It contains the goodness of Coconut Milk and 100% Natural Moisturizer that penetrates deep into your skin and nourishes it from within. Your skin is moisturized up to 24hrs.

Parachute® BODY LOTION
ADVANSED™

শেষপাতা

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

বাংলা শিল্পধারার অন্যতম পুরোধা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় ছাত্র, ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্ম ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর খড়গপুরে এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু সেসময় দ্বারভাঙ্গা এস্টেটে কাজ করতেন। মাতা ক্ষেত্রমণি দেবীর কারুকলায় এমনই নৈপুণ্য ছিল যে শিশু নন্দলালের যাবতীয় খেলনাপাতি ও পুতুল তিনি নিজের হাতে গড়ে দিতেন। মায়ের শিল্পসুষমা আত্মস্থ করে নন্দলাল কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সোনালি দিনগুলি বিভিন্ন পূজা ম-পের সাজসজ্জা করে আর মডেল এঁকে অতিবাহিত করেন।

পনের বছর বয়সে কলকাতা এনে নন্দলালকে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। ১৯০২ সালে মাধ্যমিক পাস করে তিনি এখানেই কলেজ শাখায় ভর্তি হন। এসময় পিতৃবন্ধুর কন্যা সুধীরা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পড়ার ইচ্ছা ছিল কলাবিভাগে, পরিবারের চাপে তার ব্যত্যয় ঘটলে পড়ালেখায় মন উঠে যায়– ফলে নতুন ক্লাসে উঠতে পারেননি। অতঃপর ১৯০৫ সালে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে। কিন্তু বিধি বাম! পাস করতে পারলেন না। অগত্যা পরিবার তাঁকে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেয়।

তরুণ বয়সে অজন্তা গুহাচিত্র দেখে নন্দলাল মুগ্ধ হন। ঠাকুর পরিবারের শিল্পকলা চর্চা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এসময় ওকাকুরা কাকুজো, উইলিয়াম রোদেনস্টাইন, উকোয়ামা তাইকান, ক্রিস্টিয়ানা হেরিংহাম, লরেন্স বিনিয়ন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এরিখ গিল, জ্যাকব এপস্টাইন প্রমুখ শিল্পী ও লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে কাজ করছিলেন। নন্দলাল যুক্ত হন তাঁদের সঙ্গে। চলে অবিরাম শিল্প সাধনা।

এসময় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দ কুমারস্বামী, ও সি গাঙ্গুলির মত শিল্পী ও শিল্পসমালোচকরা ভারতীয় চিত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে গঠনমূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা নন্দলালের প্রতিভা ও মৌলিকত্বের স্বীকৃতি দেন।

১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর নন্দলালকে কলাভবনের অধ্যক্ষ করে নিয়ে আসেন। এরপর শান্তিনিকেতন তাঁর শিল্পসাধনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে শিল্পবিদ্যার পাঠ নেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিংকর বেইজ, কে জি সুব্রমন্যম, আর রামচন্দ্রন, প্রতিভা ঠাকুর, শোভন সোম, জহর দাসগুপ্ত, সবিতা ঠাকুর, কোন্ডাপল্লি শেষগিরি রাও প্রমুখ ভারতবিখ্যাত শিল্পী।

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজি কারারুদ্ধ হলে নন্দলাল তৈরি করলেন বিখ্যাত সাদ্মকা লো লাইনোকাট প্রিন্ট, যা পরবর্তীকালে অহিংস আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। নন্দলালের ক্যানভাসে ভারতের পৌরাণিক কাহিনি, নারী ও নিসর্গ বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

অনেক সমালোচক তাঁকে ভারতের আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে গণ্য করেন। শৈল্পিক ও নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর শিল্পকর্ম ভারতের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৭৬ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর যে ন'জন শিল্পীর কাজ কখনও পুরনো হবে না বলে ঘোষণা করেছে, নন্দলাল তাঁদের একজন।

১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল এই মহান শিল্পী কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ ডিসেম্বর

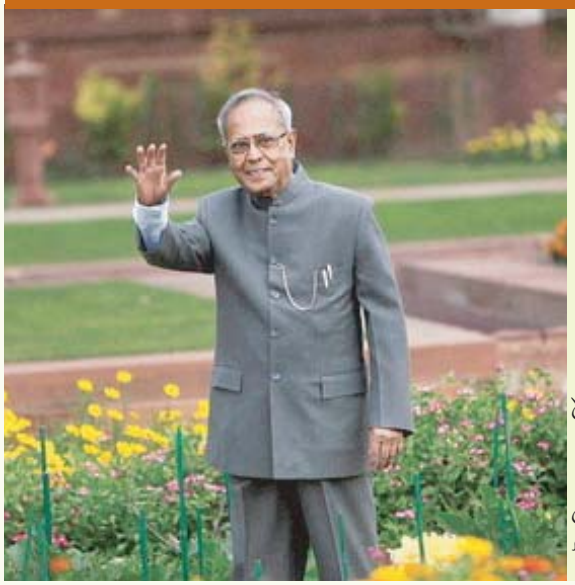
রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি

০৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ ❖ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম
০৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯ ❖ ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম
০৭ ডিসেম্বর ১৮৭৯ ❖ বিপ্লবী বাঘা যতীনের জন্ম
০৮ ডিসেম্বর ১৯০০ ❖ নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের জন্ম
০৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ ❖ বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের জন্ম
০৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ ❖ কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জন্ম
১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জন্ম
১১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ❖ রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্ম
১২ ডিসেম্বর ১৮৮৭ ❖ গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্ম
১২ ডিসেম্বর ১৯০৫ ❖ সাহিত্যিক মূলকরাজ আনন্দের জন্ম
১৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ ❖ শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম
১৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ অভিনেতা রাজ কাপুরের জন্ম
২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩ ❖ শ্রীসারদা দেবীর জন্ম
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ প্লেব্যাক গায়ক মহম্মদ রফির জন্ম
২৫ ডিসেম্বর ১৮৬১ ❖ স্বাধীনতা সংগ্রামী পি-ত মদনমোহন মালব্যর জন্ম
২৮ ডিসেম্বর ১৯২২ ❖ সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর জন্ম

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫

৩ ডিসেম্বর ২০১৪ ঢাকার ইন্ডিয়া হাউসে পার্বতী বাউলের গান পরিবেশন

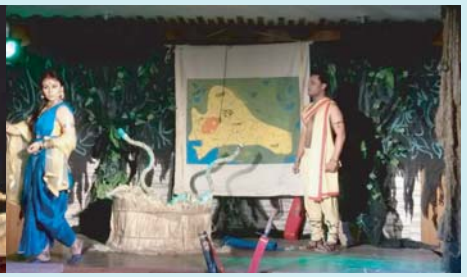

৪ ডিসেম্বর ২০১৪ ড. চঞ্চল খান পরিচালিত 'টাইমলেস গীতাঞ্জলি' ডকুফিল্মের প্রদর্শনী আগরতলায় ॥ ৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে থিয়েটার স্কুল প্রাক্তনীর নাটক *প্রথম পার্থ*-র প্রদর্শন

বাংলাদেশের ৪৪তম বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ টিএসসিতে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমুর বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন

১২ ডিসেম্বর ২০১৪ ধামনন্ডির ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বাংলাদেশী ব্যান্ড *চিরকুট*-এর সঙ্গীত পরিবেশন ॥ একই দিনে রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশন

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ধামনন্ডির ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বাংলাদেশী ব্যান্ড *শিরোনামহীন*-এর সঙ্গীত পরিবেশন ॥ একই দিনে কুমার বিশ্বজিতের সঙ্গীত পরিবেশন

২০ ডিসেম্বর ২০১৪ ধামনন্ডির ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বাপ্পা মজুমদার, এলিটা ও পার্থ বড়ুয়ার সঙ্গীত পরিবেশন ॥ একই দিনে বাংলাদেশী ব্যান্ড *শূন্য*-র পপ-রক সঙ্গীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra December 2014

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

(রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার) আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
(রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার) আবেদনপত্র বিতরণ বিকেল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত